চৈত্র
শিশু সাথী
১৩৭৩

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

শিশুসাথীর নিয়মাবলী

১। শিশুসাথীর চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদা (সডাক) : বার্ষিক—৫৲, ষাণ্মাসিক ২·৫০। প্রতি সংখ্যা ·৫০ নয়া পয়সা। **চাঁদার টাকা—"বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫নং বংকিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২"—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।**

২। **শিশুসাথীর বর্ষ বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়।** যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া বৈশাখ অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। কোন্ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইবেন, মনি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে তাহা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। **পত্রিকার মোড়কে হাতে লেখা গ্রাহক-নম্বর দেওয়া থাকে।** পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা নম্বর গ্রাহক নম্বর নহে।

৪। প্রতি মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকার পত্রিকা ডাকে পাঠান হয়। ১০ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা কারণ লিখাইয়া ১৫ই তারিখের মধ্যে চিঠি লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয়। দুই এক মাস পরে জানাইলে পত্রিকা পাঠান হয় না।

৫। বেশির ভাগ সংখ্যা যদি হারাইয়া যায়, তবে প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য ·৫০ নয়া পয়সা হিসাবে মূল্য ও রেজেষ্ট্রী করিবার খরচ মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলে রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পাঠান হইবে। কাহাকেও একই সংখ্যা বার বার পাঠান হয় না।

৬। গ্রাহকেরা প্রত্যেক চিঠি-পত্রে **নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর অবশ্য উল্লেখ করিবেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। **লেখক-লেখিকা** এবং **গ্রাহক-গ্রাহিকাদের** লেখা, তাঁহাদের তোলা ফটো এবং আঁকা ছবি সম্পাদিকার মনোনীত হইলে প্রকাশ করা হয়; তবে যে-কোন লেখা বা ছবি কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, তাহা বলা একেবারেই সম্ভব নয়। **লেখা বা ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান হয় না। লেখা সর্ব্বদা নকল রাখিয়া পাঠান দরকার,** কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। **কবিতা ফেরত দিবার ব্যবস্থা নাই।** যে-কোন লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে এবং খামের উপর বিভাগের নাম লিখিয়া দিলে সুবিধা হইবে। "শিশুসাথী" সম্বন্ধে যে-কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাক-টিকেট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ, **'শিশুসাথী'** ; ৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ১২

ফোন : ৩৪-১৫৬৪

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

নতুন বছরে শিশুসাথীর জন্য অভূতপূর্ব আয়োজন করা হচ্ছে। আগাগোড়া সব কিছুই এর ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আশা করা যায়, নতুন বছরের শিশুসাথী একখানা হাতে পেলে তোমরা আনন্দে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবে। তাই সব কিছুর আমূল পরিবর্তনের জন্য এখন থেকেই আমাদের তোড়জোড় পড়ে গেছে।

কাগজ, ছাপা, ব্লক ইত্যাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় নতুন বছর ১৩৭৪ সনের বৈশাখ সংখ্যা হতে "শিশুসাথী"র বার্ষিক চাঁদার হার সডাক পাঁচ টাকার স্থলে ৬'০০ ছয় টাকা ও ষাণ্মাসিক, ৩'০০ তিন টাকা এবং প্রতি সংখ্যা -৬০ পয়সা ধার্য করা হলো।

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

৪৫শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

শিশুসাথী

চৈত্র
১৩৭৩

বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	বসন্ত এসেছে (কবিতা)	শ্রীবাউল দাশ	৭২৯
২।	কুপকুপ	শ্রীগৌরী চৌধুরী	৭৩০
৩।	চড়াইকে : খুকু (কবিতা)	শ্রীকার্তিক ঘোষ	৭৩৪
৪।	যাদুকর	স্বপনবুড়ো	৭৩৫
৫।	হিং টিং ছট্	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু	৭৪০
৬।	মহারাজ ও বাঘ	শ্রীহরিপদ রায়	৭৪৯

শিশুদিগের যকৃৎ রোগে উপকারী

সুস্থ শিশুকেও মধ্যে মধ্যে কালমেঘ সেবন করাইলে লিভারের দোষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না

বেঙ্গল কেমিক্যালের

কালমেঘ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে কালমেঘ তিক্ত, অগ্নিদীপক, বলকারক ও পিত্তনিঃসারক
ইহা আবালবৃদ্ধ সকলের পক্ষেই হিতকর

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৭।	টুনটুনি (কবিতা)	শ্রীহিমকর গোস্বামী	১৫৪
৮।	মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়	শ্রীসুনীল সরকার	১৫৫
৯।	হীরকের কথা	শ্রীজ্যোতির্ময় হুই	১৫৮
১০।	মুক্তো চুরির রহস্য	শ্রীঅতীন মজুমদার	১৬০
১১।	জীবজগতের বুদ্ধিবৃত্তি	শ্রীঅতসি সেন	১৬৩
১২।	ছড়া		
	(১) ঢাক গুড় গুড়	শ্রীসরল দে	১৬৯
	(২) যা কবিতা মিলে যা	শ্রীশৈলশেখর মিত্র	১৬৯
১৩।	তোমাদের পাতা		
	(১) শিশু-সাথী (কবিতা)	মহম্মদ রায়হান আলী খাঁন	১৭০

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	(২) পার্থসারথি স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা	শ্রীচন্দন দাশগুপ্ত	৭৭১
১৪।	পীতাম্বর সার্কাস পার্টি	শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়	৭৭৩
১৫।	পেনাং শহরের সুপারীর যাদু	যাদুকর এ. সি, সরকার	৭৭৭
১৬।	বিজ্ঞান-পত্র	সঞ্জয়	৭৭৯
১৭।	শরীরচর্চার বৈঠক	বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়	৭৮১
১৮।	খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৭৮৩
১৯।	নতুন ধাঁধা	শ্রীঅবিনাশ চৌধুরী	৭৮৬
২০।	গতমাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম		৭৮৬
২১।	সম্পাদিকার চিঠি		৭৮৭

● ছোটদের উপহার দেবার মতো কয়েকটি বই ●

হাসির বই

শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প ১·৫০
নারায়ণ গাঙ্গুলীর হাসির গল্প ২·৫০
আশাপূর্ণা দেবীর হাসির গল্প ২·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাসির গল্প ২·০০
বুদ্ধদেব বসুর হাসির গল্প ২·০০
আশা দেবীর হাসির গল্প ১·৫০

অদ্ভুত যত গল্প (ভৌতিক গল্প সংগ্রহ] ২·০০

ক্লাসিক

ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি ২·৫০
বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান ৩·৫০
ছোটদের আরব্য উপন্যাস ২·৫০
দশ কুমার চরিতের গল্প ২·৫০
গল্পে কাদম্বরী ১·৫০
পুরাণের সেরা গল্প ২·০০
নীল সাগরের নীচে ২·০০

নানা দেশের রূপকথা ॥ মনোরম গুহ-ঠাকুরতা ২·০০
ওয়ার অ্যাণ্ড্ পীস ॥ অশোক গুহ ॥ ২·০০ পিকউইকস্ পেপারস্ ॥ অশোক গুহ ॥ ২·০০
অ্যাড্ভেঞ্চার অব্ লে ভেরী ॥ বিশু মুখোপাধ্যায় ॥ ২·০০
রবিনসন ক্রুশো ॥ অশোক গুহ ॥ ২·০০
গল্পের রাজা ক্রিলভের গল্প ॥ অনিলেন্দু চক্রবর্তী ॥ ২·০০

এ কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং ॥ ৬/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২ । ফোঃ ৩৪-৪৩১০

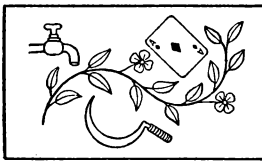

বলো তো
কি সহর?
(প্রথম অক্ষর নাও)

আটচল্লিশটা পাতাজোড়া মজাদার ছবির ধাঁধা বাংলায় এমন বই এই প্রথম

ছবির খেলো বাদল সরকার দাম? মাত্র দুটাকা!

খেলার সাথী

স্বপনবুড়োর লেখা আর শিল্পী সমর দের আঁকা বহুবর্ণের অনেক ছবি। ভারত সরকার কর্তৃক প্রশংসিত। [২·৫০]

শ্যামলা দীঘির ঈশান-কোণে

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তর ছন্দ ও শ্রীসূর্য রায়ের বহুবর্ণের অনেক ছবি। [২৫০]

কাফীস্কোপ

কাফী খাঁর আঁকা বই-এর আকারে চলন্তচিত্র। তিনটি বই, দু'টি গল্প সুদৃশ্য বাক্সে একত্রে। [৪·৫০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলকাতা-৯

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !!

খ্যাতনামা সাহিত্যিক

ডাঃ বৃন্দাবন বাগচীর

নূতন বই

চ কো লে ট

দাম—১·৫০

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

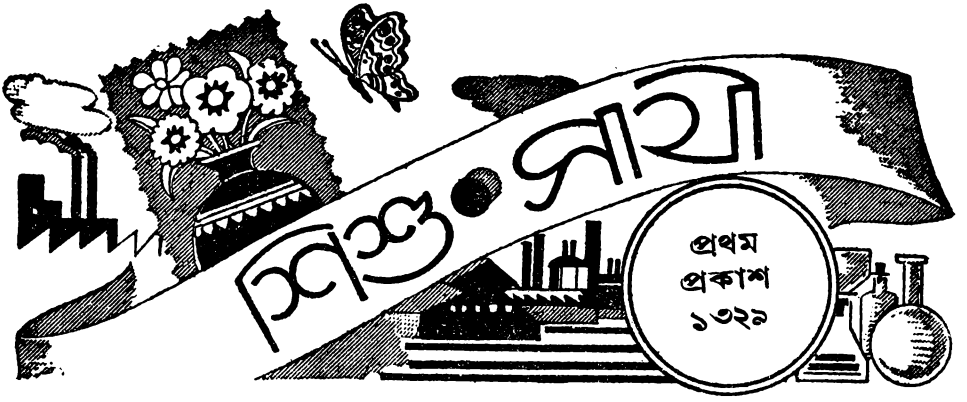

৪৫শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৭৩ | ১২শ সংখ্যা

বসন্ত এসেছে

॥ বাউল দাশ ॥

বেতবন নুয়ে পড়ে দখিনের হাওয়াতে
যে হাওয়ার সারা গায়ে মধু-মধু গন্ধ।
আমগাছে কোকিলের মিঠে গান গাওয়াতে
পলাশের বনে জাগে অপরূপ ছন্দ।

পুকুরের বুকে বুকে শালুকেরা ফুটছে
মৌ-ঝুরঝুর রোদে ঘুম ভেঙে খান খান।
সজনে-ডাঁটারা আজ দুল-দুল দুলছে
বুনো ভোমরারা আজ গুন-গুন গায় গান।

কচি ঘাসে বাছুরের ছুটোছুটি হুটোপুটি উদ্দাম!
কত কথা কইছে যে পাতা আর পল্লব
চারিদিকে রঙ-মেলা কি মধুর, অভিরাম!
সাঁওতালী পল্লীতে শিশুদের কলরব।

বনপথে মাঠে বাটে ফুল-ফুল গন্ধ।
শীতবুড়ি পালিয়েছে, এসেছে বসন্ত॥

॥ গৌরী চৌধুরী ॥

ডাঃ বিভারের হক্‌চকি

ওদের দেখে পাঁশুটে কাঠবিড়ালী বললেন—এই যে, বাঃ, বেশ, আজকের দিনটা ভারী চমৎকার—কি বলেন ?

সত্যি চমৎকার—ডাঃ বিভার সায় দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

কাঠবিড়ালী হাতের সুটকেশ দুটো নামিয়ে রেখে চুরুটটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন—আমি ডাঃ বিভারের প্রাইমারী স্কুলটা খুঁজছি। বলতে পারেন নাকি আপনারা কেউ ?

ডাঃ বিভার একটু হাসলেন—বলা মোটেই শক্ত নয়। কেননা আমিই হচ্ছি ডাঃ বিভার, আর আমার ইস্কুল ঐ ঝোপগুলো পেরোলেই—পেছন দিকে আঙুল দেখালেন ডাঃ বিভার।

এই একেই বলে কপাল !—চুরুটে আর একটা টান দিলেন কাঠবিড়ালী—সারাটা দুপুর ধরে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি মশাই। হেঁটে হেঁটে হেঁটে একেবারে হয়রান হয়ে এক্ষুণি ভাবছিলুম, আর কাজ নেই বাপু, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি, ঠিক তক্ষুণি একেবারে স্বয়ং ডাঃ বিভারের সঙ্গেই সরাসরি মুলাকাৎ ! এই যদি না কপাল হয়, তা হলে কপাল বলব কাকে ?

ডাঃ বিভার মুখটা হাঁ করলেন কথা বলার জন্যে। কিন্তু ইনি আরম্ভ করার আগেই উনি শুরু করে দিয়েছেন। কুপকুপের মাথাটা চাপড়ে কাঠবিড়ালী বললেন—এটি নিশ্চয় আপনার ছাত্র ? দেখতে তো বেশ চালাকচটক ছেলেটি।···তোমার নাম কী খোকা ?

—ক্···ক্···কুপকুপ, স্যার।

—বাঃ, বাঃ—ডাঃ বিভারের দিকে তাকালেন উনি। ডাঃ বিভারের মুখটা ভ্যাবাচাকা ভ্যাবাচাকা।

কাঠবিড়ালী বললেন—বুঝলেন ডাঃ বিভার, বড্ডো দেরি হয়ে গেছে, এখন আর আপনার সব ছাত্রকে পরীক্ষা করার সময় নেই—

এই কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুপকুপ বুঝল, আর কোন সন্দেহ নেই, ইনিই তিনি। ডাঃ বিভার সবটা বুঝে উঠতে পারার আগেই দৌড়ে পালাতে চাইল কুপকুপ। কিন্তু ওর পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গিয়েছে।

—সুতরাং সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমি এই ছেলেটিকে কয়েকটা প্রশ্ন জিগ্যেস করি—আবার কুপকুপের মাথাটা চাপড়ে বললেন কাঠবিড়ালী।

এবার ডাঃ চমকালেন—ক্···ক্···কী বললেন? আপনি···আপনি কে?

আমি?—কাঠবিড়ালীও অবাক—কেন? আমি হচ্ছি প্রফেসর কক্কড়। আসছি শিক্ষা-দপ্তর থেকে। কেন, আমার আসার কথা আপনি জানতেন না?

জা···জা···জানতুম বই কি—হেডমাস্টার তোৎলাতে লাগলেন কুপকুপের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে—কিন্তু···

প্রফেসর আর এগোতে দিলেন না—তা হলে আমরা আর সময় নষ্ট করব না। একটু বাদেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আমাকে আবার ফিরতে হবে অনেকটা—আবার কুপকুপের দিকে তাকালেন প্রফেসর। চুরুটে ফ্ ফ্ টান দিতে লাগলেন। নীল নীল ধোঁয়া উঠতে লাগল কুণ্ডলী পাকিয়ে।

কুপকুপের চোখ মাটির সঙ্গে সেঁটে গিয়েছে। বেশ বুঝতে পারছে, হেডমাস্টার আর প্রফেসর দুজনেই ওর দিকে তাকিয়ে। আবার পালাতে চাইল কুপকুপ। কিন্তু পা কি আর ওর নিজের আছে?

—আচ্ছা। তোমার চোখমুখ নাককান কতটা খোলা সেইটে পরখ করব আমি। বল তো, নেংটি ইঁদুর আর ধেড়ে ইঁদুরে কী তফাৎ?

জিভটা ভিজিয়ে নিয়ে ধেড়েবাবু আর তাঁর ক্লাসের তিন নম্বর সারির ছাত্রদের মনে করতে করতে কুপকুপ বলল—

নেংটিরা ছোট ছোট, ল্যাজগুলো লম্বা;
ধেড়েগুলো রোঁয়া রোঁয়া, গা মাখা আখাম্বা।

—বাঃ বাঃ, খাসা খাসা—মাথা নাড়তে লাগলেন প্রফেসর।

—এই ছেলেটি—ডাঃ বিভার শুরু করলেন, কিন্তু প্রফেসর কান দিলে তো? কুপকুপকে নিয়েই ব্যস্ত উনি—

আচ্ছা, যদি ধর একটা ছুঁচোর সঙ্গে তোমার দেখা হয় কিসের মত দেখতে হবে সেটা?

—ইঁদুরের মত—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কুপকুপ। প্রশ্নটা একেবারে জলবত্তরলং।

প্রফেসরের চোখদুটো খুশিতে চক্‌চক্ করতে লাগল।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! কুপকুপের ডান থাবাটা নিজের দু থাবায় ধরে জোরে জোরে ঝাঁকি দিতে লাগলেন উনি—অত্যতিশয় চালাক ছেলে। ডাঃ বিডার আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—কিন্তু—

কে শোনে কার কথা?

—যদি আপনার সব ছাত্রই এরকম হয়, তা হলে তো বলব আপনার স্কুলের মত ভালো স্কুল খুব কমই দেখেছি।

প্রফেসরের মন্তব্যটা একটু বাড়াবাড়িই হল বলতে হবে, কেননা ডাঃ বিভারের স্কুল উনি দেখেনই নি।

ডাঃ বিভার আর একবার চেষ্টা করলেন প্রফেসরের ভুলটা বুঝিয়ে দিতে, ওঁর ভ্যাবাচাকা ভাব ক্রত রাগে পরিণত হচ্ছিল—

আপনি ভুল করছেন—উনি আরম্ভ করতে গেলেন, কিন্তু এই চতুর্থবার ওঁর কথা থামিয়ে দিলেন প্রফেসর—

তাছাড়া, আপনি যাতে এর পুরস্কার পান আমি তা দেখব। নিশ্চয়। শিক্ষা-দপ্তরকে বলব আপনার মাইনেটা বাড়িয়ে দিতে, উঁহু ডবল করে দিতে।

ডাঃ বিভার হক্‌চকালেন—আমি···আমি বলতে পারি—

উঁহু। কথা নয়। আর কথা নয়। এই ছেলেটি আপনার গৌরব। আবার বলি, আপনার গৌরব, বুঝলেন? আর মাফলারটা কোথায় রাখলুম? চারদিকে একবার তাকালেন প্রফেসর —ওঃ, এই যে, গলায়। চমৎকার! আচ্ছা, চলি তা হলে, চললুম···

চুরুটটা ওদের দিকে নাড়িয়ে ঘুরে চলতে গিয়েই একটা সুটকেশের ওপর হুমড়ি খেলেন প্রফেসর। ওঃ হো, দেখেছ, ভুলে যাচ্ছিলুম! ডাঃ বিভার, এই দুটো সুটকেশে প্রাইজগুলো আছে। এই ছেলেটিকে দু'খানা বই আমি দিচ্ছি। বাকিগুলো আপনি সব বিলি করে দেবেন। এখন দেখছি আরো আনলে হত—কুপকুপের দিকে একবার তাকিয়ে কথাটা বললেন প্রফেসর।

—নাঃ, আর দেরি নয়, চলি এবার। অনেকটা রাস্তা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলি···চলি··· বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে বনের দিকে পা চালালেন প্রফেসর। কয়েক পা গিয়েই আবার একটা

কথা মনে পড়ল ওঁর, ঘাড় ঘুরিয়ে চেঁচালেন—সুটকেশগুলো রেখে দেবেন। আসছে হপ্তায় আসব। চললুম···চললুম···

এবার সত্যি সত্যিই গেলেন উনি। উনি যতক্ষণ না বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন, ততক্ষণ কুপকুপ আর ডাঃ বিভার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। কুপকুপের দারুণ ইচ্ছে করতে লাগল ওঁর পেছন-পেছন যায়, কিন্তু সাহস হল না ওর।

হঠাৎ কেঁপে উঠল কুপকুপ—

কী? তোমার কী বলার আছে নিজের সম্বন্ধে? কড়া চোখে তাকিয়ে ডাঃ বিভার বললেন।

কুপকুপের মনে হল ওর জিভটা জড়িয়ে গেছে। যতবারই কথা বলতে গেল, পারল না, শুধু ঢোক গিলতে লাগল।

ডাঃ বিভার আবার জিগ্যেস করলেন—বল, শুনি?

তখন শুরু করল কুপকুপ। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর গল্-গল্ করে কথা বেরোতে লাগল ওর।

আগাগোড়া সব বলল কুপকুপ।

কি করে মাকে রোজকার মত 'ইস্কুল যাচ্ছি' বলে, আর মাস্টারমশায়কে 'বাড়িতে অনেক কাজ, ইস্কুলে আসতে পারব না' বলে ইস্কুল পালিয়েছে, কি করে বনের মধ্যে আসতে আসতে সজারুর সঙ্গে দেখা, তারপর ডাঃ বিভার আর ওঁর ছাত্রদের নিয়ে মজা করতে চায় নি তবু কি ভাবে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়ল আর নিজের আসল পরিচয় না জানিয়ে পালিয়ে আসাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল···

ডাঃ বিভার চুপচাপ শুনলেন সমস্তটা। তারপর আস্তে আস্তে থুৎনিতে টোকা দিতে লাগলেন। অবশেষে বললেন—বড্ডো বাড়াবাড়ি করেছ তুমি।

—হ্যাঁ, করেছি—মাটির দিকে চোখ রেখে দোষ স্বীকার করল কুপকুপ।

—এজন্যে তোমার রীতিমত লজ্জিত হওয়া উচিত।

—আমি খুবই লজ্জিত, স্যার।

—তোমার শাস্তি হওয়া উচিত।

এবার আর অত চটপট সায় দিল না কুপকুপ—

—ম্···ম্···হ্যাঁ স্যার···

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে হেডমাস্টার আবার বললেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ভালই দাঁড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে। প্রফেসর কক্কড় ছাত্রদের দেবার মত যথেষ্ট প্রাইজ রেখে গেছেন, আর তাছাড়া কথা দিয়েছেন···হুঁ্ হুঁ্ হুঁ্ হুঁ্···আমার মাইনের কথাটা শিক্ষা-দপ্তরে তুলবেন।

হ্যাঁ, স্যার—মিনমিন করে বলল কুপকুপ।

হেডমাস্টার গম্ভীরভাবে বললেন—তুমি যদি ওঁর প্রশ্নগুলো ঠিকঠাক জবাব দিতে না পারতে তা হলে এসব কিছুই হত না।

—হ্যাঁ স্যার, আমি···চোখ তুলল কুপকুপ—আপনি···আপনি বলছেন···আমি তা হলে যেতে পারি স্যার?

—হ্যাঁ, যেতে পার—ডাঃ বিভার বললেন—কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরণের দুষ্টুমি করবে না। আবার যদি—

কোথায় কুপকুপ? ঐ যে বনের মধ্যে হিমবুরি গাছের আড়ালে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে ও। ওর যাওয়ার পথের ওপর উড়ছে গোল গোল ধূলোর ধোঁয়া।

চড়াই, চড়াই, ছোট্ট চড়াই···লক্ষ্মী চড়াই শোন্···
আমার পুতুল-বিয়েতে আজ তোদের নেমন্তন।
রাগ যেন আজ করিস্‌নে ভাই, করিস্‌নে কো আড়ি···
ঝাঁক বেঁধে সব লক্ষ্মীসোনা আসিস্ আমার বাড়ি।
আমার ছোট কাঁচের পুতুল—আজ হবে তার বিয়ে···
মিনুর পুতুল বর হবে আজ টোপর মাথায় দিয়ে।
বরযাত্রী কম হবে খুব—ভাবিস্ বুঝি মনে···
সাত-আট জন আসবে দেখিস্ মিনুরা ভাইবোনে!
তার পরে তো পাশের বাড়ির মিনটু আমার সই···
ওরাও সবাই আসবে দেখিস্, লাগাবে হৈ-চৈ!
লুকিয়ে আমি তাই রেখেছি—পুতুল-রাখা টিনে···
এক্কেবারে একটা টাকার ঝাল চানাচুর কিনে॥

॥ স্বপনবুড়ো ॥

তৃতীয় দৃশ্য

[চারিদিকে কুঞ্জ ও লতাপাতায় ঘেরা একটি কাকচক্ষু সরোবর। নানান জাতীয় পাখ-পাখালী ডাকছে সেই কুঞ্জবনে। সরোবরের ধারে ধারে তাল-তমাল আছে। তার ছায়া পড়েছে সরোবরের জলে। ভালো পরী ফুলটুসি আর শ্বেতপরীর দলকে নিয়ে এলো সেই সরোবরে।]

ভালো পরী : এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। সারাদিন ধরে পরীর দল, তোমরা সবাই সরোবরে সাঁতার কাটো, কুঞ্জবনে লুকোচুরি খেলো, নাচো, গাও, ক্ষিদে পেলে ফুলের মধু পান করো—কেউ দেখতে আসবে না।

ফুলটুসি : তুমি আবার কোথায় চললে ভালো পরী ?

ভালো পরী : আমার ডাক এসেছে আর একটি জরুরী কাজে। একটি ছোট্ট মেয়ে বিপদে পড়েছে। তাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।…পরাগ, অনুরাগ !

উভয়ে : বলো ভালো পরী !

ভালো পরী : সব সময়ে তোমরা দুটিতে ফুলটুসির সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ওর মন খারাপ হলে গান শোনাবে ; নাচ দেখাবে। অফুরন্ত ফুলের মধু আছে এই কুঞ্জবনে। কিছুতেই তা ফুরোবে না।

গাছে, লতায়-পাতায় ঢাকা এই সরোবর—বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাবে না। এইবার আমি চলি—অনেক দূরের পথে পাড়ি জমাতে হবে আমাকে।

[ভালো পরী আকাশপথে উড়ে গেল]

পরাগ : শ্বেতপরীর দল, তোমরা নৃত্যে-গীতে এই সরোবরের তীর নন্দন কাননে পরিণত করে তোলো। ফুলটুসি যেন বুঝতে না পারে যে, সে তার নিজের বাড়ীঘর আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বহুদূরে পরীর দেশে চলে এসেছে।

অনুরাগ : তার মুখের হাসি—আর নয়নের আনন্দ যেন কিছুতেই ম্লান হয়ে না আসে। সে যেন সদাসর্ব্বদা অনুরাগে উত্তপ্ত থাকতে পারে।

প্রথম পরী : তাই হবে গো তাই হবে। ফুলটুসিকে আমরা গানের সুরে সুরে নৃত্য-ছন্দে সব সময় জীবন্ত আর জাগ্রত করে রাখবো। ওর অধরের কোণের মৃদু হাসিটি সব সময় অম্লান থাকবে।

[শ্বেতপরীদের নৃত্য-গীত]

এই সরোবরতীরে
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটেছে কুসুম—সমীরণ বহে ধীরে।
মনে মনে আজ একি অনুরাগ
আকাশে-বাতাসে পীরিতির ফাগ
বিহগ-কাকলী সবাকার মনে নবগীতি আনে কিরে ?
এই সরোবরতীরে !

প্রাণে প্রাণে আজ এ কি শিহরণ
সুরে সুরে এ কি দোলা।
বসন-শোভায় কুসুম-ভূষায়
হৃদয়-দুয়ার খোলা !
কে আছ দাঁড়ায়ে মুখ ম্রিয়মাণ
শোনাবো মোদের সুমধুর গান
সন্তরণের জাগিছে বাসনা আজি নির্ম্মল নীরে—
এই সরোবরতীরে ॥

[গানের ও নাচের সঙ্গে পরীর দল সেই সরোবরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগলো। সেই সন্তরণে ওরা দেখতে হলো মৎস্যকন্যার মতো। জলের খেলায় রামধনুকের রঙ]

পরাগ : ফুলটুসি, তুমিও সাঁতারে যোগ দাও। আমরা দু'জনে রইলাম পাহারায়।

অনুরাগ : তাল-তমাল আর কুঞ্জবনে ঘেরা এই শান্ত সরোবরে কেউ আসবে না। তোমরা সবাই মনের আনন্দে সাঁতার কাটো। দণ্ড হাতে পরাগ ও অনুরাগ খাড়া রইলো।

[পরাগ ও অনুরাগের নৃত্য-গীত]

আমরা পাহারা,
মুণ্ডু সোজা ঘুরিয়ে দেবো আসবে যাহারা।
নাই কিরে তোর ভয় পরাণে ?
লুটবি ধূলোয় হ্যাঁচকা টানে
টেকো মাথা করবো ঘেরে তপ্ত সাহারা
আমরা পাহারা!
উঁকিঝুঁকি মারিস যদি মরবি ঘুষিতে—
অক্কা যদি চাসরে পেতে মর না খুশিতে!
ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে—
ফেলবো তোরে সরোবরে
দুম্-দুমা-দুম্ বাজিয়ে দেবো কাড়া-নাকাড়া।
আমরা পাহারা।

[পরাগ ও অনুরাগ নৃত্য-গীতে সরোবরের তীরে আসর জমিয়ে ফেললো। হঠাৎ আবার গুরু-গুরু মেঘের গর্জ্জন, কৃষ্ণ মেঘের আনাগোনা, আর সেই সঙ্গে বিদ্যুতের চমক। ডাইনী ছুটে এলো আকাশপথে। তার তীক্ষ্ণ খিলখিলে হাসি শোনা গেল।]

[ডাইনীর নৃত্য-গীত]

সাপের খেলা দেখবিরে আয় ডাইনা এসেছি—
লক্‌লকে জিব বের করে আজ মুচকি হেসেছি!
মিশকালো ঐ মেঘের দলে
চাবুক হেন চিকুর জ্বলে—
মরণকামড় দিয়েই তোদের ভালোই বেসেছি।

প: ও অ: : এ কি রে ? ডাইনীটা আবার নিজের মূর্ত্তি ফিরে পেয়েছে ? নিশ্চয়ই যাদুকরের কারসাজি!

[কোথায় যেন দারুণ শব্দ করে বজ্রপাত হলো। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বললো। সাপগুলো কিলবিল করে ছুটোছুটি করতে লাগলো। একটু পরে দেখা গেল কুঞ্জবন পুড়ে কাঁটাগাছে রূপান্তরিত হয়েছে।]

[যাদুকরের প্রবেশ]

যাদুকর : হা-হা-হা আজ আমার বিজয়োৎসব। কোথায় আছ শকুনি, গৃধিনী, কালোপেঁচার দল? এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে এসে আমায় মরণ-নৃত্যে মাতিয়ে তোলো। হা-হা-হা!

[শকুনি, গৃধিনী ও কালোপেঁচার নৃত্য]

যাদুকর : কিন্তু ডাইনী, তুই এ কি করেছিস? এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের মাঝখান থেকে কোথায় খুঁজে পাবো সেই রাজকন্যা ফুলটুসিকে? সর্ব্বনাশ করেছিস ডাইনী! তীরে এসে তুই আমার তরী ডুবিয়ে দিয়েছিস। ফুলটুসিকে ধরে এনে কালো ভ্রমর করতে না পারলে আমার মহাকালের পায়ে অঞ্জলি দান সার্থক হবে না। হায় হায়! হায় হায়!!

ডাইনী : তা হলে কি হবে যাদুকর? আমি মারতে পারি, কিন্তু কাউকে বাঁচাতে পারি না। ধ্বংস-যজ্ঞে আহুতি দিতে পারি, কিন্তু মরা ডালে ফুল ফোটাতে তো পারিনে।

যাদুকর : ব্যর্থ! ব্যর্থ! এতদিনের আপ্রাণ চেষ্টা আমার বিফল হয়ে গেল। এই যে একশোটি ফুলের মতো কন্যাকে কালো ভ্রমর করে রাখলাম একমাত্র ঐ ফুলটুসির অভাবে আমার সব কিছু প্রচেষ্টা নিষ্ফল অর্থহীন হয়ে গেল। আমিও তো কোনো মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারি না। এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই সূচিভেদ্য অন্ধকারে আমি কোন্ দেবতার পায়ে অঞ্জলি প্রদান করবো? শ্মশানের ধুমে কোন্ অমৃতের সন্ধান করবো?

ডাইনী : তাই তো যাদুকর! আমরা কি একেবারে হেরে গেলাম? আমাদের জয়লাভের কি আর কোনো সম্ভাবনা নেই?

যাদুকর : চুপ! একটা কান্নার সুর শুনতে পাচ্ছিস্ ডাইনী?

ডাইনী : কান্নার সুর? কিন্তু আমার কানে তো কিছুই পৌঁছুচ্ছে না! এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে, এই কণ্টকের ঝোপে-ঝাড়ে কে কাঁদবে? এক কাঁদতে পারে শ্মশান-শিবা আর প্রেতিনীর দল।

যাদুকর : না-না, আমি শুনতে পাচ্ছি—একটি ছোট্ট ফুলের কুঁড়ি—যে রবির আলোয়, বর্ষার বর্ষণে আর মলয় সমীরণে ফুটতে পায়নি—সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে মৃত্যুর গহ্বর থেকে জীবনের অফুরন্ত আলোর জন্যে নীরবে তপস্যা করছে! আমি তার বুকফাটা কান্না শুনতে পাচ্ছি।

[সহসা সেই কান্নার সুর থেমে গেল। উদ্দীপ্ত হয়ে জাগরণের আর জীবনের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ মূর্চ্ছনা। আকাশপথে দেখা গেল রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে মেঘের মাঝখান দিয়ে উড়ে আসছে। এক সোনালী আলো তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। সারা আকাশ জুড়ে রামধনুকের রঙ।]

যাদুকর : জীবনের জাগ্রত দেবতা রামধনুকের রাজপুত্তুর উড়ে আসছে এই পথে। আর আমাদের কোনো আশা নেই। ঐ রামধনুকের রাজপুত্তুরের হাতে রয়েছে জীয়ন-কাঠি। সেই কাঠিই তো সোনার কাঠি। জীবনের অমর মন্ত্র লেখা রয়েছে ঐ সোনার কাঠির সারা অঙ্গে।

ডাইনী : যাদুকর, তা হলে আমাদের উপায় ?

যাদুকর : নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। চল ডাইনী, আমরা আত্মগোপন করি।

[আত্মগোপন করলো]

[রাজপুত্তুর নেমে এলো আকাশ থেকে]

রাজপুত্তুর : এই কণ্টকবনে কে কাঁদে ? আমি আকাশপথে চলতে চলতে সেই মরণ-কান্না শুনে আবার এই ধূলার ধরণীতে নেমে এলাম। কোথায় সেই কান্নার উৎস ? ভয় নেই! ভয় নেই! আমি রামধনুকের রাজপুত্তুর। আমার হাতে রয়েছে সোনার কাঠি। এই সোনার কাঠি হচ্ছে জীয়ন-কাঠি। এই সোনার কাঠির পরশ পেয়ে মৃতের দল ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে। ঐ তো ঐ কণ্টকবন থেকেই ক্রন্দনের আকুল আহ্বান ভেসে আসছে। ভয় নেই—ভয় নেই! ক্ষণেক অপেক্ষা করো। সোনার কাঠির অমৃত পরশে সবাই তোমরা নবজীবন লাভ করবে।

[রাজপুত্র গিয়ে কণ্টকবনে সোনার কাঠির ছোঁয়া দিতেই ফুলটুসি আর পরীর দল প্রাণ পেয়ে জেগে উঠলো]

রাজপুত্র : [ফুলটুসিকে দেখে অবাক হয়ে] এ কি! তুমিই তা হলে আমার স্বপ্নে দেখা সেই রাজকন্যা ? শেষরাত্তিরে আমি স্বপ্ন দেখলাম—এক যাদুকর তোমায় চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি আমায় আকুল আহ্বান জানাচ্ছো—আমি যেন শুনেও শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমার শিক্ষিত পক্ষিরাজ ঘোড়া তোমার সেই বুকফাটা কান্না ঠিক শুনতে পেয়েছে। সেই যেন পথ দেখিয়ে আমায় এইখানে নিয়ে এসেছে। তোমার গলায় দুলছে গজমোতির মালা—

পঃ ও অঃ : ও ফুলটুসি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি ? ঐ গজমোতির মালা রামধনুকের রাজপুত্তুরের গলায় পরিয়ে দাও—

রাজপুত্র : হ্যাঁ, আমি তোমার মালাই চাই, আমার পক্ষিরাজ ঘোড়া পৃথিবী ভ্রমণ করে ঠিক জায়গাটিতে এসে উপস্থিত হয়েছে রাজকন্যা, দাও তোমার মালা—[মালা বিনিময়]

[সহসা সেই যাদুকরের প্রবেশ]

যাদুকর : রামধনুকের রাজপুত্তুর, আমি সেই বিশ্বত্রাস যাদুকর। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেন জানো ? আমি মৃত্যুকে আহ্বান করেছিলাম। তুমি জীবনের জয়গান করেছো। আমি মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র জানিনে। তুমি রামধনুকের রাজপুত্তুর সোনার কাঠির স্পর্শে মৃতকে

জীবন দান করেছো। তুমিই ধন্য। মানুষের এই জীবনের জয়যাত্রার কাছে আমি পরাজয় স্বীকার করছি। এই পরাজয়ে অপার আনন্দ মিশে রয়েছে।

পঃ ও অঃ ঃ কৈ গো শ্বেতপরীর দল, এই ফাঁকে তোমরা মিলনের মধুর গানের সঙ্গে ছন্দ মেলাও—

[ফুলপরীদের নৃত্য-গীত]

[আকাশে রামধনুকের রঙীন আভাস]

আজ শুধু হাসি গান মিলনের ছন্দ—
কাননের কুসুমেতে সুমধুর গন্ধ।
হাসে চাঁদ আকাশে
কথা কয় আভাসে—
সমীরণ বয়ে আনে কতোই আনন্দ।
পাখীদের কাকলীতে কী সুধা ঝরে
জ্যোছনার আলিপনা তৃণের পরে
সরোবরে চিক্‌মিক্—
হাসে শুধু ফিক্‌ফিক্—
এই রাতে থাকিস্‌নে তোরা ঘরে বন্ধ।

—যবনিকা—

হিং টিং ছট্

॥ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু ॥

—এক—

হিং টিং ছট্ !···

ভয়-মাখানো কট্‌মটে মন্ত্র। শ্মশানের পোড়াকাঠের কাছেভিতে বিদ্‌ঘুটে ভূতুড়ে চেহারার তান্ত্রিকের মুখে দাঁতকপাটি লাগানো তুক্‌তাক্ যেন !

চোতমাসের কাঠফাটা রোদ। তাতে ছাতাহীন মাথা পেতে দিয়ে, 'হিং টিং ছট্' এ বাড়ীর নড়বড়ে কপাটে টোকা দিল।

সহরের কাছেপিঠে নয়, অনেক দূরের অজ পাড়াগাঁ। সেখানকার বন-বাদাড়, ঝোপ-ঝাড়, গাছপালার জঙ্গলে হরেক রকম পশুপাখী ও পোকার দঙ্গল মজা করে থাকে। দিনরাত পেঁচা, ভূতুম ও ঝিঁঝির ডাক। শেয়ালের ক্যাহুয়া হাঁক আর অচেনা পাখীর কিম্ভুত গলার ফাঁকে সাপেধরা ব্যাঙের মরাকান্না। পোকা, মাকড়, মশা, মাছির হুলে প্যাচানো ছোঁয়াচলাগা ব্যামোর বন্যা। ওষুধ নেই, বিষুধ নেই—তারা বাঁচার জন্য কবচ-মাদুলী পরে নানা দেবতার বাথানে ধন্না দেয়।···

সবে শিবের গাজন শেষ হয়েছে। হাটের মাঝে মস্ত বড় মাঠ। তার বুড়ো বটতলায় ঠাটকরা মেলা জমেছিল। ঢাকের বাজনা, চড়কগাছের ঘুরপাক আর কাকচরিতের ফুক্‌ফাক্ থেমে এসেছে। হিং টিং ছট্ হাতদেখা আর তুক্‌তাকের ভাওতায় পরের পকেট হাতড়ে, এবার মেলা ছেড়ে গেরস্ত বাড়ীতে পা বাড়িয়েছিল।

নড়বড়ে কপাট তার টোকা খেয়ে ফাঁক হয়ে গেল। আর সে খড়মের খট্ খট্ শব্দ করে, ভেতরে ঢুকে হাঁকল, "হিং টিং ছট্।"

কেউ আটকাল না, হয়ত বাড়ীতে বেটাছেলে নেই। সে মেলায় বসে খানিক খবর জুটিয়ে এনেছে। এখানে ঠকাবার একবগ্‌গা সুযোগ আছে।

সে উকিঝুঁকি মেরে দেখল, কুমীরের মত রোদে পিঠ পেতে কুলতলায় কে বসে আছে। তার মাথায় লালশাড়ির আধ ঘোমটা ঠেলে এলোচুল ঝুলে পড়েছে। তাকে মেয়েছেলে বলে বুঝে নিতে তার ভুল হ'ল না।

সে নিজের ঝোলা থেকে মালমশলা বার করল—মড়ার খুলি, হাড়গোড় ও হরেক রকম ঠোলাঠুলি। মুখে মন্ত্র আর বাঁধা বুলি আওড়াল—

"হিং টিং ছট্—
গিন্নি মাই, সিন্নি চাই,
মিলাও ঝটপট।"

তারপর ভেঙ্গে বলল, "ত্রিকূট পাহাড় ঠেকে হিং টিং ছট্ সাদু (সাধু) নেবে এলো। মনট্রো (মন্ত্র) লাও, ডাওয়াই (দাওয়াই) লাও, মাইজী। ভালাই (ভালো) হোবে।" তার মুখে হিন্দী ও বাংলার এমন জড়াজড়ি উচ্চারণ!

তার কথার ধমকে ঘোমটামুখী চমকে উঠে মুখ ফেরাল। তাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে, হিং টিং ছট্ দাঁতে জিভ কেটে বলল, "আরে এ যে বাপ্‌জী, মাইজী নেহি! ডাড়ি আউর (দাড়ি আর) চুল ডুই (দুই) রাখলেন! কি হারালো?"

ঘোমটামুখী বলল, "দুই। গামছা হারাতে হাজামের (নাপিতের) পয়সা বাঁচিয়ে তা কেনার জন্য দাড়ি রাখলেম—তারপর কম্বল হারাতে চুল রাখলেম। গামছা গরমের, আর কম্বল শীতের সম্বল সাধুবাবা।"

হি টিং ছট্ বলল, "সাচ্ বাত্ (সত্যি কথা)। লেকিন কুছ্ ফয়ডা হোল (কোনও উপায় হোল)?"

ঘোমটামুখী মুখ কালো করে জানাল, "কিচ্ছু না। তখন হাটে একঝুড়ি ফলপাকড় চড়া দামে বেচে, সস্তায় বড়সড় দেখে একজোড়া সাদা গামছা কিনেছি। কায়দা করে লাল রংএ তা ছুপিয়ে নিয়েছি গামছাকে গামছা, শাড়িকে শাড়ি।"

—দুই—

হিং টিং ছট্ বলল, "লেকিন ডুডকা আস্বাড ঘোলমে মিলটা নেহি (কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না)। ওহি ওয়াষ্টে ত্রিকুট পাহাড়সে হাম আয়া। হিং টিং ছট্ মন্ত্রো শিখা দেঙ্গে (হিং টিং ছট্ মন্ত্র শিখিয়ে দোব)। বহুট রূপায়া মিল্ যায়েগা। সব কিন্ লেওগে (অনেক টাকা মিলবে, সব কিনে নেবে)—ব্যস্। টোমারা (তোমার) ক্যা নাম আছে?"

"আমার নাম হ'ল গিয়ে কেষ্টরাম, সাধুজী। কিন্তু গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেরা বলে কিনা কিপ্টেরাম!"

হিং টিং ছট্ বলল, "ঐছন্ ডাট্কা নাম একডম্ লোপাট্ কিয়া (অমন ডাটের নাম একদম লোপাট করেছে)। টাজ্জব কি বাট (অবাক কাণ্ড)! কুছপরোয়া নেহি, ঢনঢোলট বিল্কুল মিলা দেঙ্গে (কোনও চিন্তা নেই, ধনদৌলত সব পাইয়ে দোব)।"

কেষ্টরামের চোখ চক্‌চকে হয়। সে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "কি আর বলব সাধুবাবা। ওরা

আমার গাছের ফলপাকড় কেড়েকুড়ে খায়, কাপড়চোপড় বিছানাপত্তর আনা মাত্তর্ হাত্ড়ে নেয়। ধমক দিলে চমক-লাগানো কথা বলে।"

"কি কোঠা বোলে (কি কথা বলে) ?"

বলে, "বে'থা করো নি, ছেলেপিলে নেই, সব দান করে দাও। আরে মোল, তোদের দান করে কি চান (চাঁদ) পাব ? কি আর করা, লাঠি নিয়ে পাহারা দি। কিন্তু সারা দিনরাত তা কি সম্ভব সাধুজী ? জেগে জেগে এট্টুখানি ঘুমিয়েছি কি ব্যস্! কোচড়ে করে ভাগলপুর !"

হিং টিং ছট্ বলে, "মন্ট্র বাট্লে (মন্ত্র বলে) দিচ্ছি, সব মুস্কিল আশান হোয়ে যাবে। টুমারা এংরাজি মালুম (তুমি ইংরাজি জান) ?"

"টটমট বাংলা জানি সাধুবাবা।"

"ঐসেই হো যায়েগা। হাম্ এংরাজি কাগজ পড়্কে শুনাটা। ফি রোজ হিয়া বৈঠ্কে দশ হাজার 'হিং টিং ছট্' নাম জপো, আউর কহো লোটারি মিলা দে ভগওয়ান। জরুর মিল্ যায়েগা। (আমি ইংরাজি কাগজ পড়ে শোনাই। রোজ এখানে বসে দশ হাজার হিং টিং ছট্ নাম জপ কর আর বল ভগবান লটারি পাইয়ে দাও। নিশ্চয় পাবে)।"

হিং টিং ছট্ বিতং করে বোঝায়, "লেপেট্কাকা একঠো লোটারি কোম্পানী সবছে লোম্বা চুল আউর ডাড়িকা ওয়াস্তে (দাড়ির জন্য) ডশ (দশ) হাজার কোরে টাকা প্রাইজ ডেবে। মোট্টে ডশ টাকা ভর্ত্তিকা ফিস্ (মোটে দশ টাকা ভর্ত্তির ফি) !"

"অ্যা, দুটো মিলিয়ে বিশ হাজার টাকা !" কেষ্টরাম চোখে খোয়াব (স্বপ্ন) দেখে।

হিং টিং ছট্ বলে, "বিলিটি লটারিকা অ্যায়সাই ডষ্টুর (দস্তুর)। দেখা নেহি বিলিটি কুট্টা (কুকুর), ইণ্ডুর (ইঁদুর) আর বাইগুন্কা (বেগুনের) কেট্না (কত) গুণ !"

তবু কেষ্টরাম খুৎখুৎ করে বলে, "অত লোকের চুলদাড়ির লটারিতে ফাষ্ট হওয়া ত চাট্টিখানি কথা নয়। লাষ্টও ত হতে পারি। তা হলে ত টিকিটের টাকাই ফক্কিকারি। টিকি রাখতে গিয়ে নেড়া টিক্টিকি !"

হিং টিং ছট্ বলে, "ঐছা ফ্যাসাড হোনে নেহি সেক্টা (অমন ফ্যাসাদ হতে পারে না)। হামারা মন্ট্র আউর ডাওয়াইকা অ্যায়সাহি গুণ. চুলডাড়ি ডোনো (দুই) টড়বড় কোরকে বহুট্গুণ লোম্বা হো যায়েগা (অনেকগুণ লম্বা হয়ে যাবে)—আউর টোম প্রাইজ লুট্ লেগা (আর তুমি প্রাইজ লুটে নেবে)।" সে কর গুণে হিসেব বোঝায়,—"অর্থাৎ, ফি টিকেটছে ডশ রুপেয়া বাড (বাদ) ডে কর, স্রেফ ন হাজার ন শো নব্বই মুনাফা। আব্ ডবল করো। (ফি টিকিট থেকে দশ টাকা বাদ দিয়ে স্রেফ ন হাজার ন শো নব্বই লাভ। এবার দ্বিগুণ কর)।"

কেষ্টরামের কুৎকুতে চোখ ঠিক্রে বেরুবার জন্য ওৎ পাতে।

হিং টিং ছট্ তার ঝোলা থেকে একটা ইংরাজি কাগজ বার করে। তা উল্টো করে ধরে

পড়ে শোনায়। বলে, "আভি বিশোয়াস্ (বিশ্বাস) হুয়া? ইস্‌মে বিল্‌কুল লিখ্‌খ্যা হায়। মন্‌ট্রো কি সাঠ (সঙ্গে) এহি টেল্‌ভি চুল আউর ডাড়িমে আখ মুদ্‌কর এক রোজ মাখ্‌থো (মন্ত্রের সঙ্গে এই তেলও চুল-দাড়িতে চোখ বুজে একদিন মাখ)। ব্যস্, দোস্‌রা রোজ চুল-ডাড়ি তামাম আডমীসে লোম্বা হো যায়েগা। (ব্যস্ দ্বিতীয় দিন চুল-দাড়ি সমস্ত লোকের চেয়ে লম্বা হয়ে যাবে)। হাম্ উস্ দফে ফিন্ আয়েগা। টেপ্‌সে মাপ্‌কর লটারিমে ভেজ দেঙ্গে। (আমি সেদিন ফের আসব। টেপ দিয়ে মেপে লটারিতে পাঠাব)।"

অত্যন্ত ভরসার কথা। কেষ্টরাম "রাম রাম সাধু বাবা," বলে তাকে ভক্তি জানায় আর সে "জিটা রহো (বেঁচে থাক)" বলে জানায় আশীর্ব্বাদ।

—তিন—

হিং টিং ছট্ চলে যেতে কেষ্টরাম কুলতলায় গ্যাঁট্ হয়ে বসে, মন্ত্রপাঠ ও ওষুধ মাখার তোড়জোড় করে। অনেক টাকার মামলা তাই আইন-কানুন সামলে চলা দরকার। নৈলে হাম্‌লা দেখা দিতে পারে।

কিপ্টে মানুষ,—একাদশী, পূর্ণিমা ও তেহার-পার্ব্বণে উপোস দিয়ে পয়সার সাশ্রয়ে সে রপ্ত। একদিন নিখাকী হয়ে থাকা তার কাছে কিছু শক্ত নয়। কিন্তু চুল-দাড়িতে ওষুধ তেল মাখাতে যেয়ে ওয়াক্ থু! এমন বিট্‌কেলে গন্ধে পেটের নাড়ি ওল্টাতে চায়।

বাঁ হাতে নাকের ছেঁদা আটকে ধরে দুচোখ বন্ধ করে, সে ডান হাতে মন্ত্র টপকায়,—"হিং টিং ছট্, হিং টিং ছট্!—ভগবান ঝটপট লটারি টিকেট সবাইকে টপকে আমার বরাতে আটকে দাও।"

মন্ত্রের এমনি দাপট, ঝড় নেই ঝাপট নেই, ঠক-ঠক করে মাথার ওপরে কুলগাছ নটরাজ নৃত্য সুরু করে। সেই কাঁটাগাছের ডালে ও পাতায় ছিল থোকা থোকা শুঁয়োপোকা। ছানিপড়া চোখে কেষ্টরামের তা নজরে পড়ে নি। অথচ কারু ওজর-আপত্তি না শুনে তারা সেখানে ভিড় করেছিল। পাড়ার নষ্ট দুষ্ট ছেলেদের দৃষ্টি তা এড়ায় নি। হাড়কিপ্টে কেষ্টরামের সঙ্গে আড়াআড়িতে তাকে জব্দ করার জন্য তারা 'হিং টিং ছটের' সঙ্গে মোক্ষম ষড়যন্ত্র করেছিল। টাকার বখরার লোভ কোনও পক্ষেরই কম নয়। বাটখারায় মেপে যেন তারা ঠিক করেছিল।

কোন ফাঁকে তারা কুলগাছের ডালে দড়ি বেঁধে চালের ওপিঠে গলিয়ে নিয়েছিল। কেষ্টরাম চোখ বুজে মন্ত্রপাঠে মগ্ন, হঠাৎ তার প্রার্থনা ভগ্ন করে দড়ির টানে গাছ বেজায় নড়ে ওঠে। আর তার মাথায় দাড়িতে ও সর্ব্বাঙ্গে শিলাবৃষ্টির মত শুঁয়োপোকা ঝরে পড়ে। একটা দুটো নয়, শয়ে শয়ে। সাদা, কালো, তামাটে নানা রঙের। বাচ্চা ভালুকের মত রঙ্গ করে তারা কেষ্টরামের শরীর দুলিয়ে চলে।···

কেষ্টরাম ভাবে, তার হিং টিং ছট্ মন্ত্রের দৌলতে টুক্ টুক্ করে চুল-দাড়ির উদ্ভট বাড়বাড়ন্ত সুরু হয়েছে! খুব ভাল কথা; কিন্তু ঝড়ঝাপ্টা ছাড়া তা নড়ে, এবং শরীরের যেখানে-সেখানে চুলবুল করে চুলকায়! অসহ্য হাওয়ায় সে একসময় পিটপিটে চোখে চায়, আর অবাক হয়ে দেখে, তার সর্ব্বাঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে শুয়োপোকা, কত যে লেখাজোকা নেই!···

তখন হিং টিং ছট্ জপ মাথায় থাক, সে যেদিকে চোখ যায় ছুটতে চায়।

লেপেটকার লটারির নামে হিং টিং ছট্ এমন বাটপাড়ি করবে সে তা ভাবতে পারে নি। প্রাইজের টাকা শুঁয়োপোকার রূপ ধরে যেন কুলগাছের ডালে ঝুলছিল। এখন সে ভিখ চায় না, গেরস্ত কুকুর সামলালে বাঁচে!

প্রাইজের জন্য সে তাক্ করেছিল, এখন সব আশা ফাঁক হয়ে গেল, তা 'বুমেরাং' হয়ে তার গায়ে ফিরে এল! তার দাঁড়াল 'সসেমিরা' অবস্থা (দুদিকে সঙ্কট),—আম খাওয়া নয় 'কতলই আম' (প্রতিশোধ লাভ)!···

—চার—

দিশা হারিয়ে সে 'হিং টিং ছট্' বলে চেঁচাল। মন্ত্রের দাপটে শুঁয়োপোকারা যদি চম্পট দেয়। তারা তা দিল না, তার বদলে খট্ খট্ খড়মের শব্দ করে ত্রিকুটের সেই সাধু এসে হাজির হ'ল।

তাকে দেখে কেষ্টরাম কান্নাকাটি তুলল, "বাঁচাও সাধুবাবা।"

"ক্যা হুয়া? জপটপ ঠিকসে নেহি কিয়া? মালুম হোটা কুছ গড়বড় হো গেয়ি। ঘাবড়াও মাট্, মন্ট্র পড়নেকো চেলা লোগ বোলাটা। (কি হয়েছে? ঠিক মত জপতপ করনি? মনে হয় গড়বড় হয়েছে। ঘাবড়িও না, মন্ত্র পড়ার জন্য চেলাদের ডাকছি)।"

সে গলা তুলে হাঁকল, "এ নেপা, ঢেপা, ক্ষেপা, টুরন্টি ইটার আও। বহুট ঝঞ্ঝাট হুয়া। (নেপা, ঢেপা, ক্ষেপা শিঘ্রী এদিকে এসো। বেজায় গোল হয়েছে)।"

সলাপরামর্শ মত তারা গলা বাড়িয়ে ছিল। চেলারা পাড়ার, আর সাধুজী বেপাড়ার। কেষ্টরামকে নিংড়াবার জন্য তারা বেপরোয়া। ধরা না পড়ার জন্য মনগড়া 'মেক্ আপ' (সাজ) নিয়েছে। তা ছাড়া কারু হাতে লাঠি, কারু হাতে বঁটি, কারু হাতে ক্ষুর, কারু হাতে পেট্রলের বোতল! যে ভাবে হোক, দুশমনকে (শত্রুকে) কোতল করা (মারা) চাই!

একযোগে তারা ঈস ঈস্ করে ওঠে। কেষ্টরাম তাদের নানা কিসিমের (রকমের) ফিস্‌ফিসানি শোনে। কেউ বলে 'পিটিয়ে শুঁয়োপোকা সাবাড় কর', কেউ বলে 'কুপিয়ে', কেউ বলে 'পেট্রল জ্বেলে।' সবগুলোই সাংঘাতিক। কেষ্টরামের হাউমাউ চিৎকার দিগ্বিদিকে ছড়ায়।

তখন হিং টিং ছট্ আশ্বাস দিয়ে বলে, "ঘাবড়াটে কেউ? আভি ফয়শালা হো সেকৃটা। তুম্হারা গড়বড়সে অ্যায়সা হুয়া, লোটারি টুট গিয়া। আব্ বহুট তক্লিফমে গিরা। পহেলা দুশমনকো হটা দেনা, তব্ প্রাইজকা বাত। এটনা মেহান্নট চেলালোগকা করনে হোগা। ক্যা ইনাম ডেগা বোল? (কেন ঘাবড়াচ্ছ? এক্ষুণি মীমাংসা হতে পারে। তোমার গল্তিতে অমন হয়েছে, লটারি টুটে গেছে। এখন বেজায় মুস্কিলে পড়া গেছে। প্রথম দুশমনদের হটাতে হবে, তবে প্রাইজের কথা। এত পরিশ্রম চেলাদের করতে হবে। কি পুরস্কার দেবে বল?)"

বেকাদায় পড়ে কেষ্টরামকে খানিক কিপ্টামী ছাড়তে হয়। সর্ব্বাঙ্গে শুঁয়োপোকার নষ্টামীর কাছে এ কিছু নয়। সর্ব্বনাশ দেখা দিলে পণ্ডিতেরাও নাকি অর্দ্ধেক ছেড়ে দেয়। কিন্তু অনেক খেঁচাখেঁচি করে কেষ্টরাম এক খামচি ছাড়ে। মস্ত বড় ফলপাকড়ের বাগান ও পুকুর মিলিয়ে তা কম নয়।

চেলাদের কেউ দুঠোঁটের মাঝে আঙুল পুরে ইঙ্গিত করতে কুলগাছের দড়ি খসে যায়। পিচকারি ভরা একটা ওষুধের কড়া ধাঁচের ধাক্কায় শুঁয়োপোকারা কতক ভালুক-নাচ নেচে কেষ্টরামের চুল-দাড়ি ছেড়ে ছোটে! তখন নাপিতের পো নেপা ক্ষুর হাতে কাছে এসে দাঁড়ায়।

কেষ্টরাম ভয়ে ঢোক গিলে প্রশ্ন করে, "কি হবে?"

হিং টিং ছট্ বলে, "চুল-দাড়ি কামাটে হোবে। নেহিটো উঢারসে শুঁয়োপোকার ছোঁয়ামে টাক গজাবে। আউর লটারিকো টাকা সেই ফাকে ফাঁকি দেবে। (চুল-দাড়ি কামাতে হবে, নৈলে ওদিকে শুঁয়োপোকার ছোঁয়ায় টাক গজাবে। আর লটারির টাকা সে ফাঁকে ফাঁকি দেবে।)"

কেষ্টরাম বলে, "কিন্তু গামছা ও কম্বল চুরির ক্ষতি মেটাতে কামানো ছেড়েছিলাম। তার কেমন হবে?"

চেলাদের লাঠি, দা ও পেট্রল দেখে সে ভয়ে ভয়ে বলে, "তা হলে হিং টিং ছট্ মন্ত্র জপে যা ভাল হয় কর। এমন বেহাল অবস্থায় কামাবার পেটিস (প্রেকটিস) আছে ত?"

নেপা নাপিত ভরসা দেয়, এবং ঝোলা থেকে বড়সড় দেখে ক্ষুর খুলে তাতে ধার দেয়।

কেষ্টরাম ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কাটবে না তো?"

নেপা বলে, "না কাটলে ক্ষুর কিসের? এ ত সুড়সুড়ির জন্য নয়।"

অত বড় ক্ষুর দিয়ে নাক, কান, ঠোঁট ও অনেক কিছু কাটা যায়। কেষ্টরাম সেই ইঙ্গিত দিয়ে বলে, "খুব হুশিয়ার হয়ে কেটো। গাছে কুল হলে তোমাদের খাইয়ে দোব। এখন আমি কিছু জল খেয়ে নি।"

সে ঢক্-ঢক্ করে জল খেয়ে খানিক পিছিয়ে যায়। নেপা সাবান ও ক্ষুর হাতে এগোয়, আর কেষ্টরাম পেছোয়,—তাকে যেন পেঁচোয় পেয়েছে। তারপর তার মুখে বিদ্ঘুটে আওয়াজ বেরোয়। তার হাত ও শরীরের ভারে কতকগুলো শুঁয়োপোকা চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

নেপা ওস্তাদ নাপিত। বুরুশ ছাড়া তার ঝোলায় ছোট ঝাঁটাও ছিল। গোবর নিংড়াবার হাতিয়ারটি সে উঠোন থেকে কুড়িয়ে এনেছে। তাতে বাজিমাৎ গন্ধ! তা দিয়ে শুঁয়োপোকা ঝেঁটিয়ে সে তাকে কামানো সুরু করল।

কেষ্টরামের মনে হ'ল, তার মুখে কামান দাগা হচ্ছে! তা যেমন-তেমন, গুলিগোলার চেয়ে তার দাম কম নয়। কার মুখ দেখে সে উঠেছিল? একটু দরকষাকষি করতে নেপা বলল, "আচ্ছা পেন্নাম!"

তাকে হাতিয়ার ঝোলায় পুরে ওঠার উপক্রম করতে দেখে, কেষ্টরাম হা হা করে উঠল। হিং টিং ছট্‌কে সাক্ষী মেনে বলল, "সাধুজী, হাজামের রেট কি হতে পারে আপনি বাতলে দিন।"

—পাঁচ—

হিং টিং ছট্ বাতলে দিল,—চুনোপুটি নয়, একেবারে রুই-কাতলার দর। 'য্যায়সা কুকুর ট্যায়সা মুগুর,—য্যায়সা সওয়ার, ট্যায়সা হাতিয়ার' (যেমন কুকুর তেমন মুগুর,—যেমন ঘোড়ার চড়নদার, তার তেমন তলোয়ার)।

তারপর প্রথম দিনের মোলায়েম সুর পাল্‌টে ট্যারছা করে বলল, "সাদি নেহি কিয়া,—বালবাচ্চা হ্যায় নেহি,—এট্‌না বাগবাগিচা, টালাও, মছ্‌লি ডে কে ক্যা করে গা জী? কিস্‌কা ওয়াস্তে ছোড় যায়েগা! সাদু, সন্ন্যাসী, পড়শী কো বাঁট দেও,—আঁখেরে কাম্ হোগা। আভিটক্ ভোগ নেহি ছোড়া লোটারি মাঙ্গ্‌টা,—ক্যা মিলা? (বিয়ে কর নি, ছেলেপিলে নেই, এত বাগান-বাগিচা, পুকুর, মাছ দিয়ে কি করবে? কার জন্য রেখে যাবে? সাধু সন্ন্যাসী পড়শীদের বিলিয়ে দাও, পরে কাজ হবে। এখনো ভোগ ছাড় নি, লটারি পেতে চাও? কি পেলে?)"

কিচ্ছু না! হিং টিং ছট্ ঠিক কথা ইঙ্গিতে বলেছে। দানধ্যানে কিছু ব্যয় না করে, ভূয়ো লটারিতে সে মিছে টাকা ঢেলেছে। তাতে মিলেছে শুঁয়োপোকার বৃষ্টি!···

এখন গলায় কাঁটা আটকালে বেড়ালের পায়ে ধরার মত নেপা নাপিতের তোয়াজ না করে উপায় নেই। তাকে খুশী করতে সে এক কাঁড়ি টাকা গরচা দিতে রাজী হল।

নেপা নাপিত হিং টিং ছট্‌কে সাক্ষী রেখে বলল, "ঠিক কথা সাধুজী?"

শুঁয়োপোকার দৌরাত্ম্যে কেষ্টরাম তখন ওলট-পালট খাচ্ছিল। সে বলল, "দোহাই সাধুবাবা, ঠিক।"

তখন কামানো পর্ব্ব শেষ হল। চুল নেই, দাড়ি নেই, শুঁয়োপোকা নেই, কিন্তু তার হুলের জ্বালা পুরোদস্তর আছে। হিং টিং ছট্ আর চেলারা মুখ টিপে চোখে চোখে কি বলাবলি করল। ফের টাকার ফিরিস্তি (ফর্দ্দ)! কঞ্জুস (কিপ্টে) কেষ্টরাম তাও মঞ্জুর করল। চেলারা নুন ও সরষের তেল দিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ ডলাই-মলাই সুরু করল।

ক্ষেপা বলল, "এবার উনুনের তাতে সেঁকে তুলব ?"

হিং টিং ছট্ বাধা দিয়ে বলল, "ঐছা মাট্ করো। রূপায়াকা গরম্‌সে সেঁক দাও। বিল্‌কুল ঠিক হো যায়েগা। (ওরকম করো না। টাকার গরমে সেঁকে নাও। একদম ঠিক হয়ে যাবে)।"

তবু রক্ষা হিং টিং ছট্ উনুনের বদলে টাকার সেঁকের কথা বলেছে। মাটির তলায় কেষ্টরাম মেলা টাকা পুতে রেখেছে। যখের মত তা আগলান আছে। বেকায়দায় পড়ে আঁচলের আড়াল করে সে তার খানিক তুলল, এবং হিং টিং ছট্ চেলা নিয়ে সন্ধ্যা অবধি সেঁকে তাকে ঘুম পাড়াল। তারপর এক ফাঁকে সেই গুপ্তধনের খানিক হাতড়াল।···কতক হাঁড়িতে রূপোর টাকা, কতক হাঁড়িতে কাগজের নোট ছিল। নোটের অনেক তারা সরাল। তারপর সেখানে ওচ্ছের শুঁয়োপোকা ছড়িয়ে মাটি চাপা দিল।···

সক্কালবেলা ঘুম থেকে জেগে কেষ্টরাম হিং টিং ছট্ মন্ত্র জপল, তারপর সব কথা মনে পড়ায় গুপ্তধনের খোঁজ করল। শুঁয়োপোকার জট থেকে মুক্তি চাট্টিখানি কথা নয়, আবার গুপ্তধনের খোঁজ নিয়ে মনকে শক্তপোক্ত করাও দরকার। সে দেখল, রূপোর টাকা ঠিক আছে, কিন্তু ওরে বাবারে, কাগজের নোট জুড়ে রয়েছে গোছা গোছা শুঁয়োপোকা। তা হাতড়ে গোনার সাহস তার হ'ল না। অথচ—

এমন সময় খড়মের খট্ খট্ শব্দ করে হিং টিং ছট্ সেখানে ছুটে এল। কে জানে নোট চুরি টের পেয়ে কেষ্টরাম তাকে জড়িয়ে দেবে কি না ? থানা পুলিশ এড়াতে একমুঠো ভাঁওতা নিয়ে সে এসেছিল, কিন্তু কেষ্টরাম তাকে ভক্তি জানিয়ে বলল, "আসুন সাধুবাবা! আপনার মন্ত্রের জোরে শুঁয়োপোকারা নোটের সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে।"

হিং টিং ছটের বুকের ঠকঠকি কেটে গেল। সে যুক্তি দিয়ে বোঝাল, "অ্যায়সা জরুর হোগা হাম জান্‌তা ঠা। টেজী মন্‌ট্রসে টামাম শুঁয়োপোকা উটার হট্ গিয়া। আভি উ নোট্ বন্ যায়েগা, —তুমহারা লটারিকা প্রাইজ। যাও গুন্‌কে দেখ্‌খো। চেলালোগ চিল্লাকে কহো—হিং টিং ছট্! (এমন নিশ্চয় হবে আমি জানতাম। তেজী মন্ত্রে সব শুঁয়োপোকা ওখানে হটে গেছে। এখন ওরা নোট হয়ে যাবে,—তোমার লটারির প্রাইজ। যাও গুণে দেখ। চেলারা চেঁচিয়ে বল, হিং টিং ছট!)"

কেষ্টরাম গোনা-বাছার দিক দিয়ে গেল না। চেলাদের সঙ্গে গলা তুলে নির্ভাবনায় চেঁচাল, "হিং টিং ছট্!"

মহারাজ ও বাঘ

॥ শ্রীহরিপদ রায় ॥

দুপুরে নির্বিঘ্নে খাওয়া-দাওয়াটি সেরে বিছানায় শুয়ে বেশ খানিকটা কাব্য-চর্চা করা গেছে। এবারে চায়ের তাগাদা দেওয়া দরকার, এমন সময়ে একটা উত্তেজনার শব্দ কানে এল—মহারাজ এসেছেন! দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি তুমুল ব্যাপার চলেছে। মহারাজের মুখ কালিবর্ণ, রক্তবর্ণ চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কোট নেই, শার্টের আধখানা ছিঁড়ে ঝুলছে, সোনার য্যাণ্ডসহ সোনার রিস্টওয়াচটি উধাও হয়েছে, সর্বাঙ্গে কাদা মাখানো, পায়ের এক পাটি জুতো কোথায় গেছে, মোজা কাদায় লেপ্টে আছে, কাদামাখা সাস্‌পেণ্ডার একটা লট্‌পট্‌ করছে, জরিপাড় ঢাকাই কাপড়খানার চিহ্নও নেই, জাঙ্গিয়া মাত্র সম্বল—মহারাজ ক্ষেপে গিয়ে দুর্দান্ত চেঁচাচ্ছেন। চাকর-বাকরগুলোর সামনে না এলেও রক্ষা নেই, এলেও খিঁচুনি খেয়ে সরে যাচ্ছে, সরে গেলেও অপরাধ।

খানিকক্ষণ এ ভাবে গেলে ক্লান্ত হয়ে মহারাজ স্নান করে এসে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লেন। তার পর অনেক সাধ্যসাধনার পরে ডাবের জল আর গোটাকতক সন্দেশ খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গুম্‌ হয়ে থাকলেন। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করবে কে? ও সাহস বাড়িতে কারো নেই।

সেদিনটা ছিল জ্যোৎস্নাপক্ষের। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদ উঠেছে; চতুর্দশী কি পূর্ণিমার চাঁদ। মামাবাড়ির সামনের টেনিস লনটি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে—এমন সময়ে শোনা গেল মেজমামা আসছেন, অনেক আগেই এসেছেন দলছাড়া হয়ে। বাড়িতে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ এসেছে?"

এসেছে শুনেই নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হেসে শিকারের পোশাক ছাড়তে গেলেন। তার পরেই কতগুলো লোক সোরগোল করতে করতে এসে ঢুকল—"বাঘ মারা হয়েছে, বাঘ নিয়ে আসছে—"

একটু পরেই বহু লোক এসে জড়ো হল লনে। প্রকাণ্ড একটা চিতাবাঘের আগে পিছনের থাবা দুটো দুটো জড়ো করে কষে বাঁধা হয়েছে। তারপরে সেই দু'দুটো পায়ের মধ্য দিয়ে একটা বাঁশ চালিয়ে দিয়ে চারজন লোক কাঁধে করে বাঘটাকে আনছে। বাঘের মাথাটা আর লেজটা আগে পিছে লট্‌পট্‌ করে ঝুলছে।

বাঘটাকে এনে লনে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। বাড়ির সব ছেলেমেয়ে বৌ-ঝি চাকর-দাসী সব বেরিয়ে এসে আঙিনায় ভীড় জমাল। পাড়ার লোকও সব এলো ছুটতে ছুটতে বাঘ নিয়ে আসা হয়েছে শুনে। কিন্তু মহারাজের দেখা নেই।

সঙ্গে এসেছে মুসলমান শিকারী আসগর আলি মিঞা। বহুদিন থেকে মেজমামার সঙ্গে শিকারে যাচ্ছে। শিকারের জায়গাতে গেলে সব ব্যবস্থা করে আসগর আলি। কোথায় কোন্ জঙ্গল, কোথায় কোন্ খালটি ডোবাটি এসব তার নখদর্পণে। হাতিয়ারের মধ্যে একটা একনলা বন্দুক সট্‌গান। বুকে আছে অদম্য সাহস আর আছে অসংখ্য অভিজ্ঞতা। আসগর মিঞাকে পেলেই আমরা শিকারের গল্পটা শুনে নিই। আমরা এবারেও ধরলাম—"বলুন না অসগর মিঞা, কি হ'ল আজ? মারতে গেলেন শূয়োর, নিয়ে এলেন বাঘ শিকার করে! ব্যাপারটা কি?"

আসগর মিঞা নিজে যা বললেন সে ভাষায় বললে বুঝতে কষ্ট হবে তাই মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।

শহর থেকে প্রায় ছ' মাইল দূরে একটা ছোট্ট গ্রাম। কয়েক ঘর মাত্র চাষীর বাস। তাদের বেশীর ভাগই মুসলমান! বাকি দু'এক ঘর হিন্দু। গ্রামটার চারদিকেই চাষের জমি। জমির আশে পাশে আছে নানা আগাছার জঙ্গল ভরা পতিত জমি যার চাষ হয়নি কখনো। তার পরেই সব ঝোপঝাড় জঙ্গল। স্থানটি বাংলাদেশের দক্ষিণে সমুদ্র থেকে বেশী দূরে নয় অর্থাৎ সুন্দরবনের কাছে। ওখানে নদী থেকে খাল কেটে এনে জলের ব্যবস্থা হয় বলে ওদিকের পুকুরগুলোতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। চাষের ক্ষেত মাত্রেরই দু'দিকে না হোক অন্তত একদিকে নালা থাকবেই। জোয়ারে জলে ভরে যায় আবার ভাঁটার সময় জল সরে গেলে থাকে সামান্য জল আর ভড়ভড়ে কাদা। তার পাড়ে পাড়ে জন্মে বেতের ঝাড়। অসম্ভব কাঁটা বেতের লতাতে। বেতের সব চেয়ে মারাত্মক হ'ল বেতের আঁকড়ি। দেড়হাত দুহাত লম্বা লিককিকে ডাঁটার উপরে সার বেঁধে কাঁটা; তাদের মাথাগুলো উল্টোমুখে, অর্থাৎ ডগার দিক গোড়ার দিকে বাঁকানো কাঁটাগুলো সাজানো থাকে অসংখ্য বঁড়শির মতো। সর্বদা হাওয়াতে দুলছে। কাছে গিয়ে পড়লেই তোমার জামার কলারে, বগলে, পকেটে সুড়ুৎ করে মাথাটি ঢুকে যাবে, তুমি টেরও পাবে না। কিন্তু সরতে চেয়েছ কি বিপদ—অমনি দেখবে কম করেও তিন-চার জায়গাতে আটকে বসে আছে। বেত শক্ত কিন্তু ঐ সরু লিক-

লিকে আঁকড়িগুলো আরও শক্ত। জোর করে ছাড়াতে গেলে কাপড় হোক গায়ের চামড়া হোক আস্ত থাকবে না। যত্ন করে একটি একটি করে ছাড়াতে যাও, দেখবে ঘাড়েরটি যতক্ষণে ছাড়াচ্ছ অন্যদিক থেকে দু'খানি এসে কোমরে আর পিঠে জমে বসে আছে। বেতের উপরের দিক আর চারদিকে পাতায় লতায় এমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে ভিতর থেকে বাইরের সব কিছু লক্ষ্য করা গেলেও বাইরে থেকে ভিতরে দেখা প্রায় অসম্ভব। গোড়ার দিকে কাঁটা থাকে না বলে বেত-ঝোড়ার মধ্যে বেশ একটি ঘরের মতো জায়গা আপনা থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। এ হেন জায়গাতে নাকি একটি প্রকাণ্ড বরা অর্থাৎ বরাহ, মানে দাঁতাল শূয়োর আশ্রয় নিয়েছে। সে চাষের জমি তছনছ করে বেড়াচ্ছে, চাষীদের বাড়ির পাশের মানকচু নির্বংশ করেছে, তরকারির মাচা গুঁতিয়ে ভেঙেছে, গ্রামের একটি লোক হঠাৎ সামনে পড়ে গিয়েছিল—তার হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত উরুটা ফেড়ে ফেলেছে। ওর উৎপাতে সেখানকার চাষবাস বন্ধ হয়ে গেছে, সবাই এখন প্রাণের ভয়ে অস্থির হয়ে আছে—কখন কে ওর সামনে পড়ে যাবে। তাই আসগর আলিকে ধরে মেজবাবুর শরণাপন্ন হয়েছে ওরা।

ওখানে গিয়ে গ্রাম থেকে লোক ডেকে বার করা হ'ল। শিকারের দলে কিছু ধাঙড় নেওয়া হয়, তাদের কাজ হ'ল লাঠি, ঠেঙ্গা, বর্শা, বল্লম, মশাল, ক্যানেস্ত্রা এই সব নিয়ে হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে ক্যানেস্ত্রা পিটিয়ে জঙ্গল ঠেঙিয়ে শিকার নিয়ে আসা। জঙ্গল ঠেঙায় বলে এদের বলে 'বীটার'। তাছাড়া শূয়োর মারা পড়লে এরা মাংস খায়, বাঘ মারলে ছাল ছাড়িয়ে দাঁত আর নখ তুলে নেয়, এমন অনেক কাজ করে। ধাঙড়রা গিয়ে গ্রামের লোক নিয়ে বেশ বড় একটা দল ঠিক করে ফেলল। তার পর দল ভাগ করে লাঠি-ঠেঙা, তৈরী মশাল, ক্যানেস্ত্রা সব নিয়ে নানাদিক থেকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। আসগর আলি হ'ল এর ব্যবস্থাপক। এ সব ব্যবস্থা চলল খুব সুশৃঙ্খল ভাবে, তাড়াতাড়ি করে অথচ নীরবে। জানোয়ারগুলো হিংস্র আর মারাত্মক হলেও তাদেরও ত প্রাণের ভয় আছে। তাই ভিতরে বসে টের পেলেও ওরা চুপচাপ ঘাপটি মেরে বসে থাকে। একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে না পড়া পর্যন্ত স্থান ছেড়ে নড়ে না। সাধারণতঃ এ নিয়ম হ'ল বাঘের। শূয়োরের জন্য অত অপেক্ষা করতে হয় না। অসুবিধে হলেই তেড়ে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করে।

সেদিন সব ব্যবস্থা ঠিক করা হয়ে গেল। মেজবাবু ত শিকার করতে গিয়ে কখনো মাচায় কিংবা গাছে চড়েন না। শিকার যেখান দিয়ে বের হবে তার ঠিক সামনে বন্দুক নিয়ে তৈরী হয়ে জমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকেন। শিকারের দেখা হলেই একটি গুলিতে ধরাশায়ী করেন। অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য।

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। আসগর মিঞা ইসারা করতেই হঠাৎ একযোগে হৈ হৈ, ক্যানেস্ত্রার ঝমাঝম, মশালের আগুন, জঙ্গল ঠেঙানোর ঝপঝপ এই সব উৎপাত আরম্ভ হয়ে গেল। শূয়োরের দেখা নেই।

মহারাজকে মাঠের পারে খুব একটা নিরাপদ জায়গা দেখে একটা মস্ত আমগাছের ছায়ায় দাঁড়

করিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাবারের বাস্কেট, জলের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক সব সেখানে জমা রয়েছে। মহারাজ ছায়াতে দাঁড়িয়ে দুই কোমরে দুই হাত দিয়ে দেখছেন।

এদিকে অনেকক্ষণ চলেছে বীট করা। কোন সাড়াশব্দ নেই। শূয়োর থাকলে নির্ঘাৎ বেরিয়ে আসত। তখন ব্যাপার বোঝবার জন্য কুকুর দুটোকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তারা বেত-ঝোড়ার তলায় একটি মাত্র যে সরু পথ আছে তার মধ্য দিয়ে নীরবে সুড়সুড় করে ঢুকে গিয়ে একটু পরেই একসঙ্গে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘ্যাঁস করে একটা চাপা আওয়াজ শুনতে পেলেন মেজমামা আর আসগর শিকারী। মেজমামা জলি আর জিমিকে ডাকতেই কুকুর দুটো বেরিয়ে এলো। বোঝা গেল ওখানে শূয়োর নেই, বাঘই আছে সম্ভবতঃ।

তখন আবার আক্রমণ আর আত্মরক্ষার পদ্ধতি বদল করতে হ'ল। শূয়োর মারা আর বাঘ মারার পদ্ধতি এক নয়।

প্রথমেই ব্যবস্থা হ'ল মহারাজকে গাছে তুলে বসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে ব্যাপারটা তো সোজা নয়। ঐ সাজগোজ সমেত ঐ মোটা মানুষটিকে গাছে তোলার হাঙ্গামটা ভেবে দেখার মতো। অথচ সময় নেই মই প্রভৃতি সংগ্রহ করার। মহারাজ গাছে চড়তে জানেন না। তাতে রয়েছে কোচানো জরিপাড় ধুতি, আর চকচকে সিল্কের কোট। কাজেই দুজন গাছের উপর উঠে মহারাজের দুই বগলের তলায় হাত গলিয়ে টেনে আর নীচে থেকে তিনজনে কাঁধে করে ঠেলে তাঁকে তোলা হ'ল। মহারাজ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কী হচ্ছে?" মেজবাবু সংক্ষেপে উত্তর করলেন—"বাঘ।"

ব্যস্, আর কিছু বলতে হ'ল না। লোকজনের সাহায্যের সঙ্গে নিজের চেষ্টা যুক্ত হ'ল। মহারাজ গাছের বেশ উঁচুতে নিরাপদ জায়গাতে স্থান গ্রহণ করলেন।

তার পরে আবার চলল হৈ-হৈ ঢস্-ঢস্ ঝম্-ঝম্—ঝোপঝাড়ের উপরে ঝপাঝপ্ ঠেঙার বাড়ি। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। বাঘের দেখা ত দূরের কথা—কিছু যে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। দুপুর ছেড়ে বেলা গড়িয়ে পড়ছে বিকেলে। কোথায় বাঘ? কিন্তু সে যে নিতান্ত চাপা ঘ্যাঁস শব্দটি কানে এসেছে মেজবাবুর আর আসগর শিকারীর সেটাও ভুল হবার কথা নয়। ওঁরা এই শব্দটি বিলক্ষণ চেনেন।

অনেকক্ষণ যায়। মহারাজ গাছে বসে হাই তুলছেন। তারও পরে আরও অনেকক্ষণ গেল। তখন ঘুম পাচ্ছে। বাড়িতে এতক্ষণে দু'তিন ঘণ্টা ঘুম হয়ে যেত। কিন্তু গাছে বসে ঘুমানো নিরাপদ নয়। ওখান থেকে ঝিমিয়ে পড়ে গেলে ঘাড় ভাঙবার ভয়। তাছাড়া ঘুম পেলেই ঘুম আসবে কোথা দিয়ে? যে বিশ্রী চেঁচামেচির সঙ্গে ক্যানেস্তার সঙ্গত চলেছে, তাতে ঘুম আসেই বা কি করে? এদিকে এতক্ষণ চেঁচিয়ে ওরাও ত ঠাণ্ডা মেরে এলো। সুতরাং মহারাজ ভাবলেন, বাঘ না হাতী! নেমে পড়া যাক। বিকেলের চায়ের সময়ও হয়ে গেছে। গাছের তলাতেই রয়েছে খাবারের

বাস্কেট, ডালে ঝুলছে চায়ের ফ্লাস্ক্, ততক্ষণ এগুলোর সদ্ব্যবহার করে ফেলি। যা ভাবা আর তাই করা এটি মহারাজের চিরকালের অভ্যাস। তাই আর কাল বিলম্ব না করে অনেক কষ্টে খানিকটা নেমে তলার দিকের একখানা মোটা ডাল ধরে ঝুলে ঝুপ করে মাটিতে নেমে পড়লেন।

গাছের তলায় বিশ্রী ধুলো। কিছু পেতে বসতে পারলে বেশ আরাম পেতেন। কিন্তু সে সব কিছু আনা হয়নি। সুতরাং উপুড় হয়ে বসে বাস্কেটের ডালাটি কেবল খুলেছেন এমন সময় একটা প্রকাণ্ড হল্লা কানে এলো—"ও মশায়—কী করছেন ওখানে—বাঘ!"

হয়ে গেল খাওয়া। গাছে উঠবার উপায় নেই। ভরসা মাত্র মেজদা। সে ত বাঘের পথের সামনে, সেখানে যাওয়াও অসম্ভব। তখন বাকি ভরসা দুখানা চরণতরী। পাঁই-পাঁই করে ছুটলেন মহারাজ সেই উৎপাতের স্থানটির বিপরীত দিক লক্ষ্য করে।

সামনে পড়েছে চষা ক্ষেত, নানাবিধ ঝোপঝাড়, খানা-খন্দ, বেতঝোড়া; সব উল্লঙ্ঘন করে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চলেছেন মহারাজ। এমনিতে যে দশগজ ছুটতে গেলে হাঁপিয়ে পড়ে, একটি দৌড়ে ছ' মাইল পথ অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য যে দিগ্‌ভ্রম হয়নি। এই দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়েও ঠিক বাড়িতেই এসে হাজির হয়েছেন।

মেজমামা কাপড়-জামা ছেড়ে স্নান সেরে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজকে দেখছিনে কেন? মহারাজ কোথায়?"

খানসামা বললে—"ঘরে আছেন।"

মেজমামা বললেন—"ডেকে নিয়ে এসো।"

একটু পরেই ছোটমামা এলেন। মেজমামা বললেন—"বাঘটাকে গুলি করে ফেলবার পরে ফিরে চেয়ে দেখি তুমি ছুটছ। কত চ্যাঁচামেচি করে ডাকা হ'ল তবু শুনতে পাও নি?"

মহারাজ ঘাড় নেড়ে বললেন—"না তো!"

আসগর শিকারী বলে চলেছে, "বেতঝোড়াতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল মশালের আগুন থেকে। খানিকক্ষণ পরেই পেছন দিক থেকে চড়চড় করে আগুন বেতঝোড়ার মাথায় চড়ে বসল। তখন বাঘ সামনের দিকে বেরিয়ে এলো। এসেই দেখে মেজবাবু বন্দুক নিয়ে তৈরী। তখন ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরী হয়ে মুখ ভেঙালো। বাঘের ঐ মুখ ভেঙানোটিই বড় বিশ্রী। অনেক বড় বড় শিকারীর হাত-পা কেঁপে যায় ঐ নাক কুঁচিয়ে বিকট হাঁখানি দেখে। তার পরেই যেমন মেজবাবুকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ মারা আর অমনি দুম্ করে দাগলেন রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ দিল এক হাঁকাড়। তার পরেই মাটিতে পড়ে মাটিতে মুখ ঘষে গোঙাতে লাগল। তখন ওর কানের মধ্য দিয়ে আর একটি গুলি চালিয়ে দিয়েই সব ঠাণ্ডা। সে হাঁকাড়ে দু'খানা গ্রাম কেঁপেছে। আপনি শুনেছেন মহারাজ?"

মহারাজ বললেন—"কোথায় আওয়াজ? শুনিনি ত!"

আসগর শিকারী তাজ্জব বনে গালে হাত দিয়ে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে থাকল। পরে আবার জিজ্ঞাসা করল—"বাঘ যখন মাটিতে পড়ল তখন দেখি আপনি মাঠ পার হয়ে নালাটার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন···ওখান থেকে বাঘের হাঁকাড় আর তার পরেই আবার বন্দুকের আওয়াজ এর কিছুই শোনেননি আপনি ?"

ছোটমামা ততক্ষণে চটে গেছেন। বললেন—"না শুনিনি।"

মেজমামা হেসে বললেন—"শুনবে কি করে! যে জোরে ছুটে চলেছিল মহারাজ তাতে ওর দু'কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ করে বাতাস ছুটে গেছে। সেই বাতাসের শব্দ ভেদ করে আর অন্য আওয়াজ কানে ঢুকতে পারে ?"

মেজ মামার ব্যাখ্যা আর বলার ভঙ্গীতে উপস্থিত সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

মহারাজ তখন ক্ষেপে গেছেন। হঠাৎ ফিরেই দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করতে গিয়েই সামনে দেখলেন আমি হাসছি। আর যায় কোথায়! দুম্ করে ফেটে পড়লেন আমার উপরে। দাঁতে দাঁত চেপে সংস্কৃতে বললেন—"কাপুরুষ"; আবার ইংরেজীতে বললেন—"কাওয়ার্ড!" সেক্সপীয়রের সেই মহাজন বাক্য—'লিলি-লিভার্ড' কথাটি তখন ভুলে গেছেন।

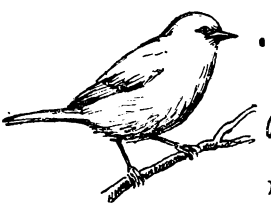

ছোট্টকালো টুনটুনি,
তোমায় দেব ঝুনঝুনি,
রাজার বেগুন তুলে যদি
আমায় খেতে দাও।
ঝুমকো দেব—গয়না দেব,
কল্‌কে ফুলের মধু দেব,
যদি তুমি ছোট্ট ডানায়
আমায় নিয়ে যাও।

টুনটুনিগো টুনটুনি
বেগুন গাছের বুনবুনি,
রাজার খেতে চুপটি করে
কি জানি কি পাও ?
গল্প তোমায় বলতে পারি
যদি আস মোদের বাড়ি,
যদি আমায় তোমার কাজে
সাথী করে নাও।

মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়

॥ শ্রীসুনীল সরকার ॥

এই কারিগরি শিল্পের যুগে যেমনি হাজার হাজার কারিগর প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ইঞ্জিনিয়ার। এদেরই নিপুণ হাতে গড়া ছোট বড় যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, ইঞ্জিন, গৃহ, বাঁধ এবং সেতু ইত্যাদি দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নতিকল্পে যেমনি সহায়তা করে তেমনি বহির্দেশের সঙ্গে সকল প্রকার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটায়।

জীবসৃষ্টি-ধারার শেষ প্রাণী বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যেই এই বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক স্ফুরণ সম্ভব হয়। কিন্তু কোন প্রাণীর মধ্যে যদি এই বৃত্তির স্ফুরণ হয় তা হলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে এদের গৃহ, বাঁধ এবং সেতু নির্মাণ শিল্পের অপূর্ব দক্ষতার কথা—যা মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়? হয়তো কেউ কেউ বলবে—ধ্যাৎ, কি সব আবোল-তাবোল বকছেন? জগতে এমন কি প্রাণী থাকতে পারে, যার তৈরী গৃহ, বাঁধ এবং সেতু মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানাতে পারে? এ হতেই পারে না। যতসব আজগুবি মিথ্যে বানানো কথা!

তোমরা বিশ্বাস করো আর না-ই করো, কথাটি কিন্তু সত্যি, অদ্ভুত সত্যি! সেই অদ্ভুত সত্যি কথাটি তোমাদের বলছি, শোন।

পৃথিবীর অংশ বিশেষের আবহাওয়ার যখন যেমন পরিবর্তন হয়েছে তখন তারই সঙ্গে তাল রেখে সেখানকার প্রাণীরাও নিজেদের বদলে নিয়েছে। ফলে, তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি দুই-ই আগেকার জীবন থেকে পৃথক্ হয়ে পড়েছে। এক প্রদেশের প্রাণীর সঙ্গে তাই আর এক প্রদেশের প্রাণীর কোন মিল নেই—তফাত অনেকখানি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের দেশের ইঁদুর ও মার্কিন রাজ্যের বিভার (Beaver) ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশীয় ইঁদুর অধিকাংশ সময় মাটির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তাতে আত্মগোপন করে থাকে। প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে বাইরে বেরিয়ে আসে খাবারের সন্ধানে। প্রাণিজগতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যাদের প্রকৃতই বড় হবার কোন আশা-ভরসা নেই, এরা তাদের অন্যতম। এদের গর্ত খোঁড়া এবং চুরি করে খাওয়া ছাড়া তেমনি কোন শিল্প-দক্ষতারও আভাস পাওয়া যায় না। মোদ্দাকথা, এদের আচার-আচরণ ও শিল্প-চর্চায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছু নেই। বরঞ্চ, এদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ, কি বলো।

মার্কিন দেশের বিভার ইঁদুর কিন্তু মূষিক সমাজের এক অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রম! গৃহ এবং বাঁধ নির্মাণ শিল্পের অপূর্ব কৌশল ও অদ্ভুত দক্ষতার জন্য এদের অনেক সময়ে 'চতুষ্পদ ইঞ্জিনিয়ার' নামে ভূষিত করা হয়।

এরা জলচর এবং অরণ্যবাসী। এদের গঠনাকৃতি বেশ বড় এবং এরা স্বাস্থ্যবানও বটে। লম্বায়ও বেশ বড় হয়। ল্যাজ বাদ দিয়ে প্রায় দুই ফুট থেকে আড়াই ফুট পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বিভারও দেখা যায়। ওজনেও এরা কম যায় না। ওজনে এক একটা প্রায় ষাট-সত্তর পাউণ্ড। ল্যাজের দৈর্ঘ্য প্রায় একফুট থেকে দেড় ফুট হয়ে থাকে।

এদের পরম শত্রু হল নেকড়ে, মিংক (Mink) এবং গ্রিজাল। এই সকল শত্রুর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে প্রতিপদে আত্মরক্ষা করতে হয় বলে, এদের বাসস্থান নির্মাণ এবং নিজেদের রক্ষার কুশলতা সত্যি মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়।

বিভার সাধারণতঃ গাছের ছাল খেয়েই জীবনধারণ করে। বিশেষতঃ নায়াগ্রা অরণ্য অঞ্চলের ম্যাপল্, লিণ্ডেন, বার্চ, পপলার প্রভৃতি গাছের ছালই এদের প্রিয় খাদ্য। এদের সামাজিকতা-বোধও জাগ্রত অর্থাৎ এরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। বংশানুক্রমে এরা সচরাচর জলাশয়ের কিনারে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং দীর্ঘকাল ধরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, এরা চল্লিশ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি গাছকে দু'দিনের মধ্যে ধারালো দাঁতের সাহায্যে খুব সহজেই ধরাশায়ী করতে পারে। এর জন্যে একটুও বেগ পেতে হয় না। আবার কাঠুরের ন্যায় ডালপালা খণ্ড খণ্ড করে কেটে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যায়। কিছুদিন বাদে রোদ্দুর লেগে কাঠগুলি যখন শুকিয়ে যায় তখন সেই কাঠের টুকরোগুলিকে পরপর সাজিয়ে বিচিত্র কৌশলে ওরা গম্বুজাকৃতি কাঠের ঘর নির্মাণ করে। আবার প্রয়োজনে তাতে কাদা মাটির প্রলেপও দেয়। একমাত্র মানুষ ছাড়া বিভারের এই গৃহনির্মাণ-শিল্পের দক্ষতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মত জীব নেই।

এরা কাঠের ঘর নির্মাণ করার প্রয়োজন তখনই বোধ করে যখন কোন হিংস্র জন্তুর আগমনের আশঙ্কা থাকে। নতুবা কখনো খোলা জায়গায় কাঠের ঘর নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করে না। কখনো কখনো এরা মন্থরগতি নদীর পাড়ে জলের নীচ থেকে সুড়ঙ্গ কেটে জলের উচ্চতার ঊর্ধ্বে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে কামরা তৈরী করে বাসস্থান রচনা করে। এই কামরাগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় সাত ফুট থেকে আট ফুট হয়ে থাকে এবং প্রস্থও অনুরূপ। শুধু তাই-ই নয়, এরা কিন্তু আরাম করে শোবার জন্যে মেঝেতে খড়পাতা বিছিয়ে কোমল শয্যাও রচনা করে।

শত্রুদের শ্যেন দৃষ্টি এড়াতে এরা কোটরে প্রবেশ করার পথ জলের নীচেই তৈরী করে। ফলে, বহিরাগত শত্রুর পক্ষে এদের আবিষ্কার করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এদের আবিষ্কার করতে হলে ডুব দিয়ে নদীগর্ভে অন্ততঃ তিন ফুট নীচে না গেলে এদের সন্ধান পাওয়া মুশকিল। সন্ধান পেলেও এদের আক্রমণ করার ব্যাপারটি কিন্তু খুব সহজ নয়। কেন না, এরা শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করার দুটো পথ রাখে। শত্রু একপথ দিয়ে আক্রমণ করার সুযোগ গ্রহণ করলেও অন্য পথ এদের পালাবার জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকে। এর থেকেই তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো যে এদের বুদ্ধি কত প্রখর।

এখানেই বিভারের বুদ্ধির পরিচয় শেষ হল না। তোমরা শুনলে আরো আশ্চর্য হবে যে, প্রকোষ্ঠের মুখ যাতে বারো মাস তিন ফুট জলের নীচে থাকে তারও ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করে। কারণ, বারো মাস তো আর নদীতে একই রকম জল থাকে না। গরমকালে নদী যখন শুকিয়ে যায় তখন ওদের গৃহের সুড়ঙ্গপথ বেরিয়েও পড়তে পারে। সেই ভয়ে ওরা ভাটির দিকে নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত শক্ত মাটি বেছে নিয়ে কাঠের সাহায্যে এক সুদৃঢ় বাঁধ তৈরী করে। এই বাঁধের উচ্চতা হয় তিন ফুট। কাঠের গুঁড়ি ও কাঠের কাণ্ড স্তরে স্তরে সাজিয়ে তাতে প্রয়োজনে আঠালো মাটির প্রলেপের সাহায্যে ওরা যে বাঁধ তৈরী করে, তা কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা করে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ। এদের বাঁধনির্মাণের কৌশল ও প্রণালী সত্যি অপূর্ব। জলস্রোত নিয়ন্ত্রণের কথা বিচার করলে আমাদের দামোদর ভ্যালি অথবা রিহ্যাণ্ড ড্যামের সঙ্গে এই বিভারড্যামের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু আকার এবং উপাদানে। জলের গভীরতা অন্তত কমে গেলেও যাতে ওদের সুড়ঙ্গপথের প্রবেশমুখ শত্রুর অগোচরে লুক্কায়িত থাকে, তার জন্যই ওরা সুকৌশলে এই বাঁধ নির্মাণ করে।

এ তো গেল গ্রীষ্মকালের কার্যপ্রণালীর কথা। এবার শীতকালীন কার্যপ্রণালীর কথা বলছি, শোন।

শীতকালে মার্কিন দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড শীত। এ সময়ে নদী-নালা, খাল-বিলের সমস্ত জল জমে বরফে পরিণত হয়। ফলে আপন গৃহকে সুরক্ষিত করার বিশেষ আয়োজন বিভারদের করতে হয়। এ সময়ে নানা প্রকার সমস্যাও দেখা দেয়। যেমন—প্রধান শত্রু নেকড়ের আক্রমণ-আশঙ্কা বেড়ে উঠে, গাছের পাতা ঝরে যায়, অরণ্যে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এছাড়া অন্যান্য হিংস্রজন্তুর আগমন-আশঙ্কা ও উপদ্রবে এরা ঘর থেকে বাইরে বেরোনোও নিরাপদ মনে করে না। কারণ, বেরোলে যে কোন মুহূর্তে শিকারীর আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়তে পারে। তোমরা বলতে পারো—ওরা যখন ঘর থেকে বেরোয় না তখন ওরা খায় কি? সত্যি কথা!

বিভার কিন্তু দূরদর্শী জীব। এরা জানে শীতকালে খাদ্যাভাব দেখা দেবে—দেখা দেবে শত্রুর প্রচণ্ড উপদ্রব ও আক্রমণ-আশঙ্কা। সুতরাং এরা সারা গ্রীষ্মকালটাই খাদ্যসংগ্রহে মেতে থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য মজুতও করে রাখে। বড়-বড় গাছ ওদের ধারালো দাঁতের সাহায্যে কেটে টুকরো-টুকরো করে, সেগুলো ভেলার ন্যায় জলের উপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নিজেদের সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখে। মোটা অথচ বড় কাঠের টুকরোগুলিকে ওরা পাথর চাপা দিয়ে ডুবিয়ে রাখে নদীগর্ভে। সারা শীতকাল সেখানে তারা পড়ে থাকে। এই পড়ে থাকা গাছের বাকল খেয়ে ওরা সারা শীতকাল জীবনধারণ করে। ফলে, এ সময়ে ওদের আর বাইরে বেরোনোর কোন প্রয়োজনই হয় না।

একটা কথা তোমাদের মনে জাগ্রত হতে পারে যে, শীতকালে যদি নদীর জল জমে বরফ হয়ে

যায় তা হলে বরফের নীচে চাপা পড়া কাঠের টুকরো থেকে, ওরা কি ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে? প্রশ্নটা অবান্তর নয়, সঙ্গত। কিন্তু তোমরা বোধ হয় জান না, শীতকালে উত্তাপ কমে গিয়ে জল জমে যখন ওপরে প্রায় দু'ফুট পুরু বরফের স্তর তৈরী করে, তখনও নদীগর্ভের নিম্নস্তরের জল তরল এবং অবিকৃত অবস্থায়ই থাকে। ফলে, সেখানে বিভারগোষ্ঠীর চলাচল এবং আহারের জন্য সঞ্চিত কাঠের বাকল সংগ্রহ করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। এভাবেই ওরা সারা শীতকালটা প্রাণিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুর উপদ্রব ও আক্রমণ-আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে, রহস্যের অন্তরালে থেকে দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। আমাদের দেশে যেমন পিপীলিকাকে অক্লান্ত কর্মীর আদর্শ বলে গণ্য করা হয়—স্বীকৃতি দেওয়া হয় বাবুই পাখীর গৃহনির্মাণ-কুশলতাকে, তেমনি মার্কিন রাজ্যেও বিভাররা অনুরূপ মর্যাদা পেয়ে থাকে। এজন্য মার্কিন সরকার আইন করে বিভার হত্যা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কেন করবে না বলো? এরা কখনো কোন অন্যায় করে না। করে না বৃথা সময় অপচয়। এদের শুধু কাজ আর কাজ। খাদ্যসংগ্রহ, গৃহনির্মাণ, বাঁধনির্মাণ, মৃত্তিকা-খনন, আপন গৃহকে শত্রুর নজর থেকে সুরক্ষিত করা ইত্যাদি কাজে এরা সকল সময়ই ডুবে থাকে। এমন নিরলস প্রাণীর দৃষ্টান্ত জগতে বোধ হয় বিরল, কি বলো!

শুনলে তো, প্রাণিজগতের অত্যাশ্চর্য জীব বিভারের কথা। এবার নিশ্চয়ই তোমাদের বিশ্বাস হয়েছে। আবার হয়তো কেউ কেউ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছ। কেউ কেউ ভাবছো—এদের বাঁধ এবং গৃহনির্মাণের বিচিত্র কৌশল, কাষ্ঠাহরণ, এবং কুশলতার সঙ্গে সেগুলি জলের উপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া, বাঁধ নির্মাণের স্থান এবং বনিয়াদ নির্বাচন, নির্ভুলভাবে জলের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ, ঋতু পরিবর্তনের হিসেব, এবং এমন কি সম্ভাবিত বরফস্তরের বেধ পর্যন্ত নির্ভুলভাবে গণন—সত্যি মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়। কি তাই না!

হীরকের কথা

॥ জ্যোতির্ময় হুই ॥

তোমরা নিশ্চয় মহামূল্য রত্ন হীরকের নাম শুনেছ এবং কেউ কেউ হয়তো হীরক দেখেও থাকবে। পড়াশুনায় ভাল এবং গুণী ছেলেকে বড়রা 'হীরের টুকরো ছেলে' বলে অভিহিত করে থাকেন অর্থাৎ হীরক যে খুবই মূল্যবান এটা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি যদি বলি ভূসোকয়লা এবং হীরকের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই তা হলে তোমরা বিশ্বাস করবে কি? বিশ্বাস

করতে কষ্ট হলেও জেনে রাখো ভূসোকয়লা, গ্র্যাফাইট্ (যা দিয়ে পেন্সিলের সীস তৈয়ারী হয়), হীরক-রত্ন প্রভৃতি একই মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক রূপ। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সমপরিমাণ হীরক, গ্র্যাফাইট্ এবং ভূসোকয়লাকে বাতাসে উত্তপ্ত করলে সমপরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস পাওয়া যায়।

এই হীরক খনিজ পদার্থরূপে ভারতবর্ষের গোলকুণ্ডায়, ব্রেজিলে, রাশিয়ার ইউরাল পর্বতমালায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরক পাথরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এই হীরক-মিশ্রিত পাথরগুলিকে বাইরে জলবাতাসে ফেলে রাখা হয়, ফলে পাথরগুলি ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙ্গে যায় এবং পরে এই টুকরোগুলিকে যান্ত্রিক উপায়ে আরো ছোট ছোট করে ফেলা হয়। এরপর এই পাথর-চূর্ণগুলিতে জল মিশিয়ে চর্বিমাখানো মসৃণ টেবিলের উপর দিয়ে প্রবাহিত করলে ভারী হীরকখণ্ডগুলি চর্বিতে আটকে যায়। এই ভাবে হীরককে খনিজ অবস্থা থেকে নিষ্কাশিত করা হয়। আমাদের দেশে কোনও কোনও নদীতীরের বালির সহিত হীরক মিশ্রিত থাকে ; সেগুলিকেও ঐ উপায়ে নিষ্কাশিত করা হয়।

বিশুদ্ধ হীরকখণ্ড একটি অষ্টতল স্ফটিক এবং তা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। হীরকের সহিত অশুদ্ধি মিশ্রিত থাকার দরুণই হীরক বিভিন্ন রং গ্রহণ করে। এই হীরকের টুকরোগুলিকে সুকৌশলে কেটে মহামূল্য রত্নে পরিণত করা হয়, টুকরোগুলিকে কাটার উপর এর ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে। পৃথিবীর মধ্যে শুধু হল্যাণ্ডে হীরক কাটার ব্যবসা আছে।

হীরকের ওজন একটি নূতন এককের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়, এই একক হ'ল ক্যারেট্। এক ক্যারেট্ = $\frac{1}{5}$ গ্রাম। সবচেয়ে ভারী হীরক হ'ল কুলিয়ান, এর ওজন ৩০৩২ ক্যারেট্ অর্থাৎ প্রায় ৬০৬ গ্রাম। এ ছাড়া কোহিনূর হীরকের ওজন ১৮৬ ক্যারেট্ অর্থাৎ প্রায় ৩৭ গ্রাম। হীরক পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন মৌলিক পদার্থ। বোয়ার্ট (boart) নামে কালোরংয়ের একপ্রকার হীরক আছে, রত্ন হিসাবে এর কোনও মূল্য নেই ; কাঁচ কাটার কাজে, পাথর কাটার যন্ত্রে ও পালিশের কাজে এই হীরক ব্যবহৃত হয়।

কৃত্রিম কাঁচের টুকরো এবং হীরক পৃথক্‌ভাবে চেনার জন্য রঞ্জনরশ্মি ব্যবহৃত হয়। রঞ্জনরশ্মির সামনে হীরকখণ্ডকে স্বচ্ছ মনে হবে, কিন্তু কৃত্রিম কাঁচের টুকরোকে স্বচ্ছ মনে হবে না। এর কারণ হীরকের মধ্য দিয়ে রঞ্জনরশ্মি প্রতিসৃত হতে পারে। এই ভাবে হীরককে অন্যান্য কাঁচখণ্ড থেকে পৃথক্ করে চেনা যায়।

মুক্তো চুরির রহস্য

॥ শ্রীঅতীন মজুমদার ॥

লণ্ডনের এক অভিজাত দোকান। সোনা-রূপোর গহনা থেকে বহুমূল্য হীরে-জহরৎ পর্যন্ত বিক্রি হয় দোকানটায়।

সেদিন দুপুরে বিরাট এক গাড়ি হাঁকিয়ে এক ভদ্দরলোক এলেন দোকানে। পরণে তাঁর দামী স্যুট। মুখে দামী পাইপ।

তাঁকে দেখে কাউণ্টারের সেলস্‌ম্যান ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠল। বিনীত নমস্কার জানিয়ে, বিশেষ খাতির করে প্রশ্ন করল : কি চাই স্যর?

জবাবে ভদ্দরলোক জানালেন, তাঁর দামী মুক্তো দরকার। সেলস্‌ম্যান সঙ্গে সঙ্গে দামী মুক্তোর একটি কেস বের করল। তারপর তার থেকে মুক্তোগুলো বের করে গুণে গুণে কাউণ্টারের সামনের টেবিলে রাখল।

ভদ্দরলোকটি মুখ থেকে পাইপটা নাবিয়ে মুক্তোগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। একটার পর একটা পরীক্ষা করে প্রায় সবগুলো মুক্তোই যখন দেখা শেষ হল, তখন তিনি জানালেন যে কোনোটিই তাঁর পছন্দ নয়।

নিরাশ হয়ে সেলস্‌ম্যান এবার মুক্তোগুলো গুণে গুণে কেসে রাখতে গিয়েই 'থ'! এ কি—একটা মুক্তো গায়েব! প্রথমে সে বেশ হতভম্ব হয়ে গেল। ভাবল, হয়ত তার গোণার ভুল হয়েছে। কিন্তু না,—পর পর তিন বার গোণার পরও দেখল সেই একই ব্যাপার,—একটা কম। ভাবল—তা হলে গেল কোথায়? এই টেবিলেই তো সে রেখেছিল! এবার সে ভালো করে টেবিলের ওপরটার চারদিকে দেখল। কিছুই পেল না। টেবিলের তলায়ও তন্ন-তন্ন করে দেখল—যদি তলায় পড়ে গিয়ে থাকে। কিন্তু না,—তলায়ও নেই। তা হলে গেল কোথায়?

ভয়ে সেলস্‌ম্যানের মুখ শুকিয়ে গেল। মুক্তোটা পাওয়া না গেলে তার চাকরি থাকবে না যে! আর চাকরি যদিও বা থাকে, দোকানের মালিক কি তাকে এমনি ছেড়ে দেবে? প্রতি মাসে তার মাইনে থেকে বিরাট একটি অংশ কেটে নেবে যদ্দিন না মুক্তোর পুরো দাম শোধ হয়।

ভদ্দরলোক তখনও দাঁড়িয়ে। সেলস্‌ম্যান কি করবে ভেবে না পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে দোকানের ম্যানেজারকে জানাল। ম্যানেজার শুনে তক্ষুণি ছুটে এলেন কাউণ্টারে। তারপর নিজেও ভালো করে গুণে দেখলেন,—তাই ত! সত্যিই একটা মুক্তো কম।

ম্যানেজার এবার ভদ্দরলোকটির দিকে তাকালেন। তারপর বেশ গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন : মুক্তোটা দিয়ে দিন ভালোয় ভালোয়—নয় ত আমরা পুলিস ডাকতে বাধ্য হব।

ম্যানেজারের কথায় ভদ্দরলোক তো চটেই লাল : কি—এত বড় আস্পর্ধা! আমি মুক্তো চুরি করেছি!

: বটে! তা হলে পুলিসকে ডাকি।—ম্যানেজার বললেন।

: ডাকুন।—ভদ্দরলোক বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই জানালেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুলিস ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল। ম্যানেজারের কাছ থেকে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত শুনে নিয়ে পুলিস প্রথমে সেলস্‌ম্যানের ও পরে ভদ্দরলোকের দেহ তল্লাসী করল। কিন্তু কিছুই পেল না।

পুলিস এবং ম্যানেজার তখন ভদ্দরলোকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। ভদ্দরলোক দোকান থেকে বেরিয়ে দোকানের সামনে রাখা গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিলেন।

কিছুক্ষণ পর পুলিসও কেস লিখে নিয়ে চলে গেল। মুক্তোর কোনো কিনারাই হল না।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। ম্যানেজার বসে বসে ভাবছেন—বড় তাজ্জব ব্যাপার তো! মুক্তোটা কি হাওয়া হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! মুক্তোটার দামও তো নেহাৎ কম নয় যে, 'যাক গে' বলে ছেড়ে দেবেন।—নাঃ, ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হবে। ম্যানেজার ফোন করে ডেকে পাঠালেন একজন নামকরা গোয়েন্দাকে ব্যাপারটার সুরাহা করে দেবার জন্যে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গোয়েন্দাপ্রবর এসে হাজির হলেন। ঘটনাটি আগাগোড়া শুনে নিয়ে যে টেবিলে মুক্তোগুলো সাজিয়ে ভদ্দরলোকটিকে দেখান হয়েছে, তার ওপরটা ভালো করে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোনো সূত্রই পেলেন না। বেশ একটু চিন্তান্বিত হলেন তিনি।

এবার তিনি একটু ঝুঁকে টেবিলের উল্টো পিঠটা দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে এক টুকরো হাসি খেলে গেল।

এবার তিনি ম্যানেজারকে বললেন : নিশ্চিন্ত থাকুন। একটু পরেই মুক্তো-চোর কিংবা তার কোনো লোক আসবেই ফিরে, সঙ্গে লঙ্গে মুক্তোটাও আপনি ফিরে পাবেন।

মেল্‌সম্যানটিকেও গোয়েন্দা নিশ্চিন্তে তার কাজ করে যেতে বললেন। তারপর নিজে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে কাউন্টারের অদূরে বসে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে টানতে লাগলেন আর দোকানে যে সব খদ্দের আসা-যাওয়া করছিল, তাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখতে লাগলেন।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। হঠাৎ কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল একটি খদ্দের। খদ্দেরকে দেখে তিনি বেশ একটু উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। খদ্দেরটি একটি যুবক,—রূপোর সিগারেট কেস কিনতে এসেছে।

সেলস্‌ম্যান তাকে একটা রূপোর সিগারেট কেস দিতেই, সে দাম মিটিয়ে যেই দোকানের দরজার দিকে পা বাড়াবে, অমনি গোয়েন্দা চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্রুত পায়ে গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে হাসতে হাসতে বললেন : কিহে, খুব তো মাথা খাটিয়ে সঙ্গীটা বের করেছ, কিন্তু ধোপে টিকল না—এই যা দুক্ষু!

: ম্‌-ম্‌-মানে? কি বলতে চান আপনি?—যুবকটি সজোরে বলে উঠল।

: আমি বলতে চাই, ওহে চাঁদবদন, মানে মানে পকেট থেকে মুক্তোটা বের করে দাও।—হাসতে হাসতে জানালেন তিনি।

: মুক্তো? কি বাজে বকছেন—ভদ্রভাবে কথা বলুন!—যুবকটি যেন বেশ রেগেই বলে উঠল।

: বটে!—বললেন গোয়েন্দা। পরক্ষণেই যুবকটির গায়ের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতেই একটি সুন্দর দামী মুক্তো বেরিয়ে এল।

মুক্তোটা নিয়ে সেলস্‌ম্যানের দিকে চেয়ে এবার তিনি বললেন : নাও হে তোমাদের মুক্তো। ম্যানেজারকে বলো পুলিসে এখুনি ফোন করতে। আসামীর একজন ধরা পড়েছে—কান টানলে মাথা আসে—একে জেরা করলে আসল মক্কেলকেও পেতে বেশী বেগ পেতে হবে না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুলিস এসে হাজির হল।

গোয়েন্দাপ্রবর এবার তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন : ঘটনাটি আগাগোড়া শুনে যখন জানতে পারলাম যে পুলিস এসে সেলস্‌ম্যান এবং ভদ্দরলোকটির দেহ তল্লাসী করেও মুক্তোটা পায়নি, তখনই আমার মনে হল, মুক্তোটা সরান হলেও দোকানের বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি। তারপর ম্যানেজারকে আমি সেলস্‌ম্যানটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন যে, সে প্রায় ছ'-সাত বছর ধরে এই দোকানে কাজ করছে এবং আজ পর্যন্ত কোনো অবিশ্বাসের কাজ করে নি। তাছাড়া সে অত্যন্ত সৎ এবং ধার্মিক।

ম্যানেজারের কথা শুনে আমার সমস্ত সন্দেহ ঐ লোকটির ওপর গিয়ে পড়ল। সেল্‌সম্যানকে জিজ্ঞেস করলাম তখন যে, ভদ্দরলোকটি কাউণ্টারের টেবিলের সামনে ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিলেন, না মাঝে মাঝে দোকানের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছিলেন। সেলস্‌ম্যান জানাল, তিনি সে কাউণ্টারের টেবিলটার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেখান থেকে এক পা-ও নড়েন নি। তারপরেই আমি টেবিলের ওপরটা ভালো করে পরীক্ষা করলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না। শেষে একটু ঝুঁকে টেবিলের উল্টো দিকটা পরীক্ষা করতেই জলের মত সব পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখলাম, টেবিলের উল্টো দিকে কিছুটা মোম লাগান এবং তাতেই মুক্তোটা আটকে আছে। আসলে ভদ্দরলোকটি পকেটে করে মোম এনেছিলেন এবং সেই মোম প্রথমে টেবিলের উল্টো দিকটায় লাগিয়ে দেন এবং পরে মুক্তো পরীক্ষা করার ছলে সেলস্‌ম্যানের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে একটা মুক্তো হাত

সাফাই করে এ মোমে আটকে দেয়। ফলে মুক্তোটা টেবিলের উল্টো পিঠের ঐ মোমে আটকে থাকে। টেবিলের ওপর থেকে এর কিছুই বোঝা যায় না। আমি কিন্তু দেখেই বুঝতে পারি যে মুক্তো চুরি করার এ সব অভিনব ফন্দী এবং একজন কেউ মুক্তোটা নিতে আসবেই আসবে। তাই আগন্তুকের অপেক্ষায় বসে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই যুবকটি আসে এবং সিগারেট কেস কেনার অছিলায় কাউণ্টারের সামনের টেবিলটার উল্টো পিঠটা হাতড়ে হাতড়ে, মুক্তোটা মোম থেকে খুলে পকেটে পোরে। এখন আমার কাজ শেষ।

গোয়েন্দাটি এবার পুলিসের দিকে চেয়ে বললেন: একে নিয়ে যান। তবে আসল আসামী এ নয়। ঐ ভদ্দরলোকটিই আসল আসামী – এ তারই দলের একজন মাত্র। এর কাছ থেকেই তার খবর পাবেন।

বলা বাহুল্য, পুলিস যুবকটিকে অ্যারেস্ট করার পর উপযুক্ত জেরা করে আসল আসামীকেও ধরতে সমর্থ হয়েছিল।

জীবজগতের বুদ্ধিবৃত্তি

॥ শ্রীঅতসি সেন ॥

কথামালা, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্রের গল্প তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। দেখেছ সেখানে জন্তু-জানোয়ার পশুপক্ষীরাও কেমন কথা বলতে পারে, সময় সময় জ্ঞানীর মতন উপদেশও দেয়। সেগুলো গল্প হলেও আসলে কিন্তু নীতিমালা। তাদের মুখ দিয়ে লেখক যে শুধু আমাদের জ্ঞানদান করেছেন তাই নয়, তাদের জীবন তুলে ধরে শিখিয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা করতে। অনুসরণ করতে তাদের বুদ্ধি, কর্মকৌশল আর জীবনযাত্রাকে। হাসির কথা নয়, হেলায় তুচ্ছ করার জিনিসও নয়। সত্যি সত্যিই মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করতে হয়েছে। আজকে আমরা জেট বিমানে আকাশজয়ে ব্রতী হলেও একদিন পাখীদের ওড়ার ভঙ্গী অনুকরণ করেই আমাদের প্রথম উড়োজাহাজ (গ্লাইডার) তৈরী করতে হয়েছিল। আর একথা শুনলে হয়ত বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে, তারও আগে পাখীদের মতন ডানা লাগিয়ে ওড়ার চেষ্টাও মানুষ কম করে নি।

কলাশিল্পে মানুষ শুধু একাই ওস্তাদ নয়, পশুপাখী কীটপতঙ্গ সমাজেও আর্টিস্ট কম নেই।

ললিতকলার ক্ষেত্রে তাদের কারিগরী এতই চমৎকার যে দেখলে বিমুগ্ধ হতে হয়। মাকড়সার জাল, মৌমাছির চাক কি বাবুই পাখীর বাসার গঠননৈপুণ্য দেখে মানুষ ইঞ্জিনিয়ারকেও সেলাম ঠুকতে হয়।

মাকড়সা প্রথমে জায়গাটা বেছে নিয়ে, তাকে ঘিরে চার-পাঁচটি বেশ মজবুত পাড় টানে। তারপর প্রায় দু'ডজন সুতো চক্রাকারে টেনে জালের মধ্যে এনে মেশায়। ক্রমে টানা-পোড়েনের ভঙ্গীতে টেনে 'টাইট' করে বাঁধে। এর মধ্যে একটা রাস্তা নির্দিষ্ট থাকে তার নিজের ব্যবহারের জন্যে আর একটা থাকে 'শিকারের'। বিপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার বন্দোবস্তও থাকে তাতে। শিকার জালে বাঁধা পড়লেই যে কম্পনটুকু হয় তাতেই মাকড়সা তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। এই ধরণের কম্পন অনুভবশক্তি ছোটখাট প্রায় সব প্রাণীর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। কেঁচো গর্ত থেকে মাথা বের করেই ঢুকিয়ে নেয় যখনি সে আমাদের পদকম্পন পায়।

মাকড়সাদের এক নজরে দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, তারা ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে। তারা জানে আজকের এক কোঁড় কালকের মস্ত ফুটো আটকায়। তাই জাল ছিঁড়লেই চোখের নিমেষে এমনই মেরামত করে ফেলে যে জোড়া বলে কোন চিহ্নই থাকে না। মানুষ একাই যে শুধু মাছধরার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে তা মোটেও ভেবো না। ভেলা মাকড়সা (রাফ্‌ট স্পাইডার) বলে এক জাতের জলার মাকড়সারা গাছের পাতা জাল দিয়ে সেলাই করে নৌকো বানিয়ে ভাসে। পোকামাকড় ধরতে ইচ্ছে হলেই জাল ফেলে বসে থাকে, জালে টান পড়লেই নেমে গিয়ে ধরে।

স্থির, নির্মল জলের তলায় যারা বাস করে সে সব মাকড়সা আবার আরও বুদ্ধিমান। প্রথমে তারা জলনিরোধক জাল দিয়ে ছোট্ট একটি কোটর তৈরী করে। তারপর সেটি উল্টোমুখ করে কোন জলজ উদ্ভিদের গায়ে বেঁধে কি কোন পাথরের ফাটলে ঢুকিয়ে রাখে। এরপর তারা জলের ওপরে গিয়ে তাদের লোমশ দেহে বায়ুবিম্ব (এয়ার বাবল্) ধরে আনে, আর সেই জালের কোটরে ঝেড়ে ঝেড়ে বোঝাই করে। এই ভাবে সমস্ত কোটরটি হাওয়ায় ভরে গেলে, সেই ঘরে সে তার শিকার ধরে এনে বন্দী করে রাখে, ডিম পাড়ে, তা দেয়।

ছোট ছোট এক জাতের মেঠো মাকড়সা আবার বুদ্ধি করে আকাশেও ওড়ে। গরমের দিনে, উপযুক্ত আবহাওয়া পেলেই তারা ঢিবিঢাবা কি ঝোপঝাড়ের চূড়োয় উঠে চীৎ হয়ে শুয়ে মাথাটা বাতাসের দিকে রেখে জাল ছাড়তে থাকে। সরু সরু, হাল্কা, প্রায় ওজনবিহীন সুতোগুলোকে গরম হাওয়া মাটি থেকে উঁচুতে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে তারা তাদের অভিনব বিমানবহর তৈরী করে, আর দমকা হাওয়ায় পালে বাতাস লাগতেই তারা ভেসে পড়ে। কখনও কখনও কয়েক হাজার ফুট ওপরেও ওঠে, আর কয়েক শো মাইল রাস্তাও পাড়ি দেয়। নামবার সময় ওপর থেকে জাল ফেলে, তাই বেয়েই নেমে আসে।

এ ত গেল মাকড়সাদের কথা, মৌমাছিদের সভ্যতার কথা ভাবলেও অবাক হয়েই যেতে হয়। তারা পরিশ্রম করে, গড়ে তোলে, সঞ্চয় করে। মানুষদের মতন মৌমাছি-পিঁপড়েদেরও সমাজ আছে। তাদের অনেকের ভাষাও আছে (যদিও সে শব্দ শোনার শক্তি আমাদের কানের নেই)। একজন কেউ খাদ্যবস্তুর সন্ধান আনলেই দলে দলে সেই পথের নিশানা ধরে ছুটে যায়। কর্মী মৌমাছিরা তাদের নাচের মধ্যে দিয়েই একে অন্যকে 'মধু'র সন্ধান জানায়। সূর্যের সঙ্গে স্থানটির কৌণিক দূরত্বের ওপরেই নাচের ভঙ্গিমা নির্ভর করে। পরিচ্ছন্নতা, নিয়মশৃঙ্খলা, নৃত্যগীত, খেলাধূলা, কোন বিষয়েই তারা আমাদের পিছনে পড়ে নেই। শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের শাস্তিবিধানও তাদের জীবন বিচিত্রার অন্যতম। যুদ্ধবিগ্রহ, আক্রমণ, আত্মরক্ষাও তাদের সৈন্যবিভাগকে অবিরতই করতে হয়।

মৌমাছি ছাড়া মথদেরও চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তারা আলো লক্ষ্য করেই ছোটে। আলো যদি বাঁ দিক থেকে আসে অর্থাৎ বাঁ চোখে এসে পড়ে, তা হলে সে তার বাঁ পাখাটির গতি কমিয়ে দেয় যাতে সে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ সেই আলোক-কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে। ডান চোখে আলো এসে পড়লে করে ঠিক এর উল্টো।

মৌমাছিরা নিজেদের দেহনির্যাস থেকেই তাদের বাসা বা 'চাক' তৈরী করে। কিন্তু বোলতারা আবার শুকনো গাছের গুঁড়ো দাঁত দিয়ে বের করে, লালার সঙ্গে মিশিয়ে, অনেকটা আমাদের চূণবালির মতই তৈরী করে। তাদের চাকের বাইরে আবার পর্দাও ঝোলে যা নাকি ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচায় আর ভেতরটাও গরম রাখে।

বাবুই-বাসার কারিগরী আর রচনা-কৌশল মনোমুগ্ধকর। ঝুড়ি বোনার মত লতাপাতার কি ঠাশবুনুনি। বাবুই বড় শৌখিন—বাসায় আলোর ব্যবস্থাও সে করে রাখে। গোটাকয়েক জোনাকি পোকা ধরে এনে খানিকটা গোবর কি কাদার তালের সঙ্গে আটকে রাখে।

একজাতের ক্ষুদে পিঁপড়ে আছে যারা আবার 'এপিড্‌স্' বলে এক রকম গোলাপফুলের পোকা ধরে বন্দী করে রাখে আর গরুর মত তাদের দুধ দুয়ে খায়। শুধু তাই নয়, এপিড্‌সের ডিমগুলোও তারা বহু যত্ন করে জমিয়ে রাখে ; নতুন পোকা জন্মালে তাদের ফুলগাছে রেখে আসে আর কিছুকাল পরে আবার তাদের ধরে এনে দুধ খেতে থাকে। গোবরে পোকা ও আরও অনেক পোকাকেই পিঁপড়েরা তাদের ঝাড়ুদারের কাজে বহাল করে। আমাজন নদীর পিঁপড়েরা আবার নিজেদের বাসাও খুঁড়তে পারে না, পারে না খাদ্য যোগাড় করতেও। তাই তারা আর এক জাতের ছোট ছোট পিঁপড়েকে আক্রমণ করে তাদের বাচ্চা আর ডিমগুলো কেড়ে নিয়ে আসে। পরে সেই সব বন্দী দাসেরাই তাদের বাচ্চা প্রতিপালন করে, খাবার যোগাড় করে আনে আর বাসা তৈরী করে দেয়।

'চাষা পিঁপড়ে' বলে একজাতের মরুবাসী পিঁপড়ে আছে যারা আগাছা, ঘাস কি বুনো

গাছগাছড়ার বীজ সংগ্রহ করে এনে, খোসাটি ছাড়িয়ে বাড়ীর বাইরে ফেলে দিয়ে ভেতরের শাঁসটি শুধু তাদের মাটির নীচের বাসায় যত্ন করে জমিয়ে রাখে। যদি সেগুলো কোন রকমে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায় তা হলে আবার বাইরে এনে রদ্দুরে ছড়িয়ে শুকিয়ে নিতেও ভোলে না।

কিছু কিছু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পিঁপড়ে তাদের মাটির নীচের বাসায় 'ছাতা'র বাগানও করে। তারা গাছের পাতা কেটে মাথায় করে সবুজ ছাতার মত বয়ে নিয়ে যায় খাবার জন্যে নয়। প্রথমে সেগুলো চেটে পরিষ্কার করে নেয়, যাতে অন্য কোন জাতের ছাতা তাতে লেগে না থাকে। তারপর সেগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে চিবিয়ে 'সার' তৈরী করে, যা নাকি তাদের একমাত্র খাদ্য। এ জাতের ছাতা ওদের বাসা ছাড়া আর কোথাও জন্মে না।

জলের অভ্যন্তরে জলনিরোধক বাসগৃহ নির্মাণের কৌশলই শুধু আবিষ্কার করে নি, বীবরদের নৈপুণ্যের চরমপ্রকাশ নদী-বন্ধনের বিস্ময়কর কারিগরীতে। মানুষদের বাঁধ নির্মাণের অনেক আগে থেকেই উত্তর আমেরিকায় 'বীবর' বলে এক জাতের জলচর প্রাণী বাঁধ বাঁধতে জানত। ওদের সেতুবন্ধনের উপকরণও একান্তই বাহুল্যবর্জিত। যন্ত্রপাতি বলতে চারটি ধারালো দাঁত আর দুটো সুপটু নরম থাবা। মালমসলার তালিকাও বনের অঢেল কাঠ আর নদীতটের উপল আর মৃত্তিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বীবরেরা যখন ওদের ধারালো দাঁত দিয়ে কেটে বড় বড় গাছ মাটিতে ফেলে, তখন আশ্চর্যের বিষয়, তাদের অপরিসীম নিপুণতার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি জলের দিকেই হেলে পড়ে। ফলে অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে টেনে নিয়ে যেতে হয়। মানুষেরাও অনেক সময় এদের সাহায্য গ্রহণ করে। কখনও কখনও ছশো ফুট দীর্ঘ বাঁধও মানুষদের জন্যে এরাই নির্মাণ করে দেয়। রামচন্দ্রের কাঠবেড়ালি গল্পকথা হলেও এ কাহিনী কিন্তু কঠিন সত্য।

'র‍্যাটেল' আর 'ব্যজর' বলে ধূসর বর্ণের প্রাণীরা আবার খুব পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়। তারা তাদের বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূরে মাটির মধ্যে গর্ত করে পায়খানা করে আর পরে মাটি চাপা দিয়ে ঢাকা দেয়। তাছাড়া তাদের নখগুলোও বেড়ালের মত গাছের গায়ে ঘষে চকচকে করে রাখে।

যাযাবর পাখীদের বাৎসরিক ভ্রমণের সবচেয়ে অদ্ভুত তাদের সময়ানুবর্তিতা। বসন্তকালে কোকিলের ডাক এতই স্বতঃসিদ্ধ যে সেই ডাকই আমাদের কাছে বসন্ত আগমনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ঘরমুখো পায়রারা সোজা ঘরেই ফেরে বলে আবহমানকাল থেকে অনেক গোপন বার্তা-বহনেই তারা দূত হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। একটা পায়রা রোম থেকে ইংল্যাণ্ডে তার বাসায় এই হাজার মাইল উড়ে গিয়েছিল কুড়ি মাইল সমুদ্র আর পাহাড়পর্বতের বাধা অতিক্রম করে। একবার এক পথভুলো মানুষকে রাতের অন্ধকারেও তার ঘোড়াই পথ চিনিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। বেড়ালকে বাক্সে বন্দী করে হাজার মাইল দূরে ছেড়ে দিয়েও দেখা গেছে সে ঠিকই ফিরে এসেছে।

নানান ব্যাপারে কুকুরের প্রভুভক্তির পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি এতে বোঝা যায় যে,

ইতরজীব হলেও তাদের বোধশক্তি সামান্য নয়। সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস্ পাহাড়টি বছরে ন'দশ মাস বরফে ঢাকা থাকে। পাহাড়ের নিরুদ্দিষ্ট ভ্রমণকারীদের উদ্ধারকল্পে 'সেণ্ট বার্নার্ড' জাতের কুকুরেরা সদাই তৎপর। তারা নিজেরাই তুষারের আবরণ সরিয়ে মুমূর্ষুদের খুঁজে বের করে অনেক সময় প্রয়োজনবোধে পিঠে করেও বয়ে নিয়ে আসে আশ্রমের আশ্রয়ে। ওদেশে ত কুকুরেরাই ভেড়া চরায়, অন্ধ প্রভুকে পথ দেখায়, বাচ্চাদের রাস্তা পার করায়, আরও কত কি!

এমন চিতাবাঘের কথাও শোনা গেছে যে তার প্রভুর জন্যে হরিণ ধরে আনে। পোষমানা কুনকী হাতিরা বন্য হাতিদের ভুলিয়ে এনে খোঁয়াড়ে পোরে, পরে তাদের পোষও মানায়। শরৎচন্দ্রের 'কার্তিক গণেশ' অলীক কল্পনা নয়। অনেক মাছই শব্দ শুনতে পায়, যদিও আমাদের মত কান তাদের নেই। আমরা যে জাতীয় উঁচু পর্দার সুর শুনতে পাই না, বাদুড়-ইঁদুরেরা তাও শুনতে পায়। তাছাড়া প্রতিফলিত শব্দ শুনে দিক নির্ণয় ও দূরত্ব পরিমাপ করতেও তারা সমর্থ। তাই অন্ধকারে আমরা যেখানে অন্ধ তারা সেখানেও দেখতে পায়। মৌমাছিরা শুধু যে রঙের পার্থক্যই বিচার করতে পারে তাই নয়, যে 'অতিবেগুনী' রঙ আমরা দেখতে পাই না তারা তাও দেখে। কালো মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা থাকলেও তাই তার পথনির্দেশ তারা কখনই হারায় না। তাছাড়া যাত্রাপথ, দিকপরিচয় ইত্যাদি স্মরণ রাখার শক্তিও তাদের আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 'মৌমাছি নেকড়ে' বলে এক জাতের বোলতা একটা নতুন পরিবেশে বাসা বাঁধলে, ছ সেকেণ্ড দেখেই পথপরিচয় এমনই মনে রাখে, যাতে এক ঘণ্টা পরেও সে ঠিক চিনে ফিরে আসতে পারে।

উদাহরণ দিতে বসলে আর শেষ হতেই চাইবে না। কথামালায় সেই কাকটা যে কুঁজো থেকে জল খেতে না পেরে নুড়ি ফেলে জলটাকে উঁচু করে এনেছিল, সেটা তোমরা গল্প বলেই ভাব। কিন্তু গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে সত্যি সত্যি এক জাতের পতঙ্গভুক গাইয়ে কাঠঠোকরা আছে যাদের ঠোঁট খুব ছোট। তাই পোকামাকড় ধরতে অসুবিধে হয় বলে তারা এক টুকরো কাঠি ঠোঁটে ধরে গাছের ফাটল কি গর্ত থেকে লুকানো শিকার খুঁচিয়ে বের করে। শিকার বেরিয়ে এলেই তারা কাঠিটি মুখ থেকে ফেলে দিয়ে তাকে খেয়ে ফেলে।

কাক আর দাঁড়কাকরাই পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাদের অনেক রকম কথাবার্তার নির্দেশনামা আছে আর তাই দিয়ে বিপদসংকেত ও নানান খবরাখবর আদানপ্রদান করে থাকে। পাখীদের স্নায়ুমণ্ডল যথেষ্ট বিকশিত বলে তাদের স্মরণশক্তি সমস্যাসঙ্কুল জীবনযাত্রায় অনেকাংশে সহায়তা করে। অপর্যাপ্ত খাদ্যভাণ্ডারের সন্ধান ত ভোলেই না, এমন কি খাদ্য সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনেও তাদের বুদ্ধির বিকাশ অপরিসীম। দাঁড়কাক কি অন্য অনেক পাখীই শামুক, কাঁকড়া জাতীয় শক্ত খোলাওলা প্রাণী পাথরের গায়ে ঠুকে ঠুকে কি ঠোঁটে করে অনেক উঁচু থেকে ফেলে দিয়ে ফাটিয়ে খায়।

'কপুচীন' জাতের স্ত্রী-বানরের খাঁচায় কলা ঝুলিয়ে রেখে দেখা গেছে, হাতের নাগালে না পেলে তারা বাক্সের ওপর বাক্স রেখেও তা পেড়ে খায় (বিনা শিক্ষাতেই)। চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জী কি বাঁদরেও লাঠি দিয়ে উঁচুতে ঝোলানো কলা টেনে নামায়। তীরন্দাজ মাছ (আর্চার ফিশ্) বলে পূর্ব ভারতীয় কিছু ছোট জাতের মাছ আছে যারা মুখের জল পিচকারীর মত ছুঁড়ে অসতর্ক শিকারকে পাড় থেকে জলে ফেলে। মাত্র ছ'-সাত ইঞ্চি দেখতে হলে হবে কি, পাঁচ-ছ' ফুট দূর অবধি অদ্ভুত টিপ করে তারা জল ছুঁড়তে পারে।

জীবজগতের শিশুপালন লক্ষ্য করলেই তাদের স্নেহমমতা বুদ্ধিপ্রবৃত্তি সব কিছুরই জাজ্বল্য প্রমাণ দৃষ্টিগত হয়। সিচলিড্ বলে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত ও সিংহলের এক জাতের মাছেরা তাদের ডিমগুলিকে মুখের থুথু দিয়ে পাথরের গায়ে আটকে নিজেদের পাখনা দিয়ে হাওয়া করে তাদের বাঁচায়। প্রাণিজগতের সর্বত্রই দেখা যায় তারা ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে রাখে। কাঠবেড়ালী, ইঁদুর, পিঁপড়ে, মৌমাছি সকলেই এ বিষয়ে সমান পারদর্শী। এমন কি, নিঃসঙ্গ কোন বোলতা মারা যাবার আগে তার অনাগত উত্তরপুরুষের জন্যেও খাদ্য সঞ্চয় করে রেখে যায়। প্রথমে তারা মাটিতে ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে তাতে মৃত শুঁয়োপোকা আর গঙ্গাফড়িং রেখে তবে তার ওপর একটা করে ডিম পাড়ে আর মাটি চাপা দেয়। এই জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তি থেকেই পশুদের অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় শুধু মানুষই নয়—জীবজগতেও এর বিকাশ বিরল নয়।

পশুপাখীদের মনেও আছে কবির রসজ্ঞান, চিত্রশিল্পীর কল্পনা-কুশলতা আর বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তি। আমরা জীবজন্তুদের এই সব অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকলাপের নাম দিয়েছি প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রবৃত্তিটা কি—না, প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলা। একটা মানুষ অন্ধকারে পথ হারালে যখন সে আকাশের তারার নিশানায় তার পথ খুঁজে পায় তখন আমরা সেটাকে বলি বুদ্ধি (জ্ঞান, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ও বলে থাকি), কিন্তু যখন একটা হারানো কুকুর মাইলের পর মাইল পথ চিনে ফিরে আসে, আমরা তাকে বলি প্রবৃত্তি। যে বৃত্তির উন্নয়নে কেউ নিজের অভিজ্ঞতাকে উন্নত করতে পারে, তাকেই যদি বুদ্ধি বলা হয়, তবে প্রাণিজগতের জীবনযাত্রাকেও বা তার থেকে বঞ্চিত করব কেন ?

কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে জন্তু-জানোয়ারের এই সব ক্রিয়াকলাপ তারা তাদের বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা বিচার করে করে না। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। কিন্তু অপরদিকে মানুষকে বিচার করলেও কি দেখা যায় না যে, তারও কাজকর্মের মাত্র সামান্যতম অংশই সে ঠিক কার্যকারণ যুক্তি-বিবেচনার দ্বারা করে।

ছড়া

ঢাক গুড় গুড়

॥ সরল দে ॥

ঢাক গুড় গুড় ঢাক গুড় গুড়
ঢাকনা দিয়ে রাখ,
চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে—
কখন হবে ফাঁক।

ঢাক গুড় গুড় ঢাক গুড় গুড়
কে ঘুর ঘুর করে?
বাইরে আছে কাক-পক্ষী,
হুলো বেড়াল ঘরে।

ক্ষুদে পিঁপড়ে ডেয়ো পিঁপড়ে,
ইঁদুর আরশোলা,
দেখলে ওদের সপ্‌সপিয়ে
উঠতে পারে নোলা।

খোকন বলে, তার চে' ভাল
পেটের মধ্যে থাক!
ঢাক গুড় গুড় ঢাক গুড় গুড়—
এককেবারে ফাঁক॥

যা কবিতা মিলে যা

॥ শৈলশেখর মিত্র ॥

যা কবিতা মিলে যা—
নেবুর পাতা করম্‌চা।
লোহার থেকে ফুল তুলে
গরম বরফ তুলতুলে—
লাগিয়ে হ'ল নরম যা।
যা কবিতা মিলে যা।

মিলছে না আর ছন্দ যেই,
ভাবছি করি বন্ধ খেই—
দস্যি ছেলে চোদ্দটা
মিলিয়ে দিল পদ্যটা—
মিশিয়ে ঘোলে গরম চা।
যা কবিতা মিলে যা।

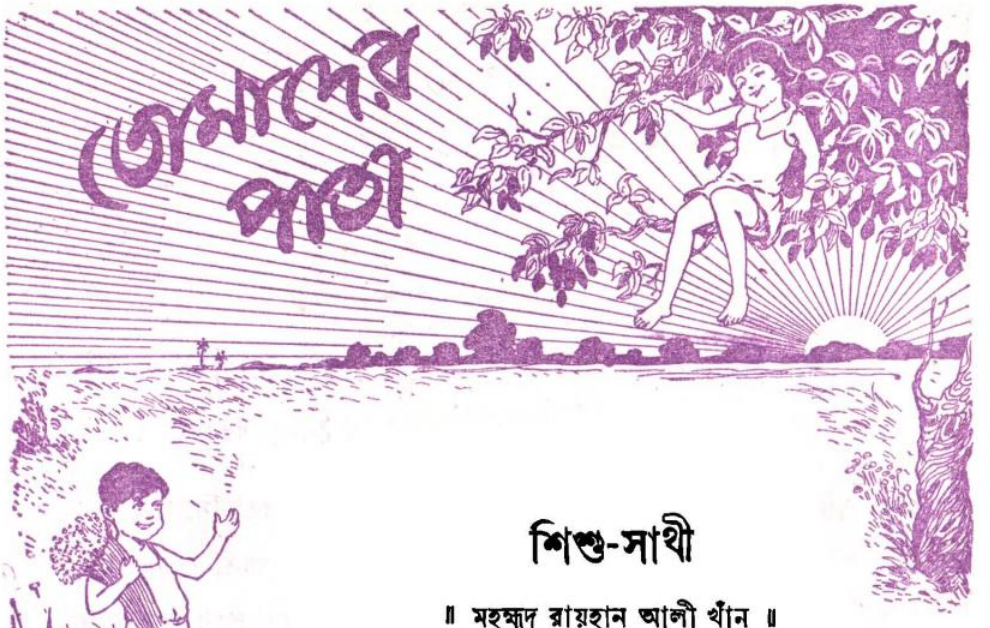

শিশু-সাথী

॥ মহম্মদ রায়হান আলী খাঁন ॥

(গ্রাঃ নং ২০৫২৫)

আজকে মোরা ছোট্ট শিশু বড়র তুলনায়,
আগামী কাল দেবে মোদের উচ্চাসনে ঠাঁই।
আজকে মোরা ছোট্ট তবু কালের পানে চেয়ে
চলতে হবে, গড়তে শরীর কালের তরী বেয়ে।

ভাবী কালের ভরসা মোরা ছোট্ট শিশু সবে
বড় হওয়ার স্বপ্ন কিছু দেখতে মোদের হবে।
সামান্য হোক সেই স্বপ্ন নয়কো তবু হেয়
সেটাই হবে এগিয়ে চলার মোদের পাথেয়।
শিশুরা কে প্রদীপ-শিখা। হোক না আঁধার রাতি,
আলোর শিখা জ্বালিয়ে দেবে মোদের শিশু-সাথী।

পার্থসারথি স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

[প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা]

পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও সততার মান

॥ চন্দন দাশগুপ্ত (গ্রাঃ নং ২০৭৬৩) ॥

মান নির্ণয় দুরূহ বিষয় সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ সততা বা পিতামাতার প্রতি ভক্তিজাতীয় বিষয়ের মান নির্ণয় দুরূহতর। কেননা এগুলির কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই এবং এগুলি নির্ভর করে সমাজ-সংসারের আবর্তন-বিবর্তনের উপর, কালচক্রের গতির উপর। এই বিষয়গুলি বস্তুগত (metallic) নয় বলে, এদের মান নির্দেশ করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয়।

আধুনিক জীবনযাত্রার আঙ্গিকের সঙ্গে যদি অতীত জীবনযাত্রার তুলনা করতে যাই তা হলে অবশ্যই চোখে পড়বে যে পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও সততা জাতীয় বিষয়ের মান বিশেষভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের সুমহান জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বচনে-বাচনে, তন্ত্রে-মন্ত্রে যা সুপরিস্ফুট—তার মধ্যে পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং সততা উভয়কেই অত্যন্ত উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে। "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা" অথবা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ইত্যাদি বাক্য পিতামাতাকে মনের মণিকোঠার উচ্চ আসনটিতে বসাতে শেখায়, আর সততাকে যে অতি অবশ্যপাল্য বিধি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বস্তুত, "পিতামাতার প্রতি ভক্তি" এবং "সততা" দুটো ভিন্ন বিষয়, যদিও একই সময়ে দুটোর সংজ্ঞা আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমটি নিয়েই প্রথমে আলোচনা করি :

দিন বদলাচ্ছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় পৃথিবী পরিবর্তিত হচ্ছে। পুরাণো সজ্জা ছেড়ে অঙ্গে তুলছে নতুন আভরণ। আর তারই সঙ্গে তাল রেখে পিতামাতার প্রতি ভক্তির সংজ্ঞা বদলাবে, এতে আর আশ্চর্য কি। সংজ্ঞা বদলানোকে অনেকে নীচু মানের প্রকাশ বলে গণ্য করেন, তাঁদের ধারণা সকল সময়ে সত্য নয়। পূর্বে যা ছিল অবশ্য পাল্য, আজ তাকে যুক্তির তুলাদণ্ডে ফেলে বিচার করা হচ্ছে মাত্র।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধা নেই যে, পিতামাতার প্রতি ভক্তির মানের গতি নিম্ন

দিকে। যুক্তি দিয়ে সকল জিনিসের বিচার সম্ভব নয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের স্থান এখনো আছে। আগে পিতামাতাকে অগ্রাহ্য অথবা অমান্য করা অকল্পনীয় ছিল—আজ তা অতি নগণ্য ঘটনা। শাশুড়ী-পুত্রবধূর চিরাচরিত দ্বন্দ্বে অধিকাংশ পুত্রই বধূর পক্ষে।

মোটকথা, আদর্শের সেই ব্যাপকতা ও উদাত্ততা (sublimity) যে কমে গেছে, এতে কোন সন্দেহই নেই।

তাই, বিভিন্ন উদাহরণ দেখিয়ে প্রাচীনেরা বলেন, আধুনিক যুবজনের মধ্যে পিতামাতার প্রতি ভক্তির একান্ত অভাব, কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, দেশে দেশে যুগে যুগে কালে কালে নবায়নের জোয়ার আসে। তার মধ্যে লুকানো কিছু আবর্জনা থাকাও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু শাশ্বত সত্যও তারই মধ্যে নিহিত থাকে।

'সততা' সম্বন্ধে কিছু বক্তব্যও আমার আছে। সত্য মহান, সত্য সুন্দর, সত্য অবিনশ্বর—শিব ও সুন্দরের প্রতীক। সত্যের ব্যঞ্জনায় যা পরিমূর্ত তাইই সুন্দর, সত্যের ছোঁয়ায় যাঁর জন্ম তিনিই শিব।

আজ সত্য নিদারুণ অবক্ষয়ের পথে, প্রায় অবলুপ্তির স্তরে। মিথ্যার পঙ্কিলতা আমাদের সমাজ-সংসারকে বিষিয়ে তুলেছে। প্রথমে ধোঁয়ার মতো, তারপর কুয়াশার মতো, তারপর ঘন কালো মেঘের মতো সত্যের উজ্জ্বল সূর্যকে মিথ্যা ঢেকে ফেলেছে। কখনো বা মেঘ সরে, স্নিগ্ধ ঝিলিক লাগে দেহে মনে, কিন্তু অধিকক্ষণই সূর্য মেঘাবৃত। মিথ্যা বন্যার স্রোতে সত্যের পাকা বনিয়াদও ভেঙ্গে পড়েছে। সত্যের স্থান কি কোথাও আছে? না, কোথাও নেই। না গৃহে, না বাইরে, না ছাত্রজীবনে, না কর্মজীবনে, না অবসর জীবনে—কোথাও নেই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আজ মিথ্যাশ্রয়ী। পথের দুধারে সারি সারি সাইনবোর্ড দোকানের মহিমা সগর্বে ঘোষণা করছে—"সততাই মূলধন" বা "Honesty is our only capital"। অথচ দু টিন ঘি কিনলে দেখা যাবে, উপরে দু-আঙ্গুলটাক ভালো, বাকীটা পচা।

সত্যের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি এখনো না ঘটলেও, গোধূলিলগ্ন উপস্থিত। তাই, অতীতের পাশাপাশি অধুনা সমাজ একেবারে নিষ্প্রভ। বিভূতিভূষণের 'রুপোকাকার' মতো সত্যবাদী আজ নেই বলেই উজ্জ্বল আলোর পাশে মাটির প্রদীপের মতো, বসন্তের উজ্জ্বলতার পাশে শীতের বিষণ্ণতার মতো আধুনিক সমাজ অতীত সমাজের পাশে নিষ্প্রভ।

সত্যের পরিবর্তে মিথ্যার আগমন কখনোই সুখপ্রদ নয়। "মা ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্"—একটি অবিসংবাদিত সত্য হলেও ভূয়ো মিথ্যার বেড়াজাল থেকে মুক্তি আশু প্রয়োজন।

উপসংহারে বলি, এই সব অনাচারের পথ রুদ্ধ হলেই পৃথিবী হয়ে উঠবে সত্য, শিব ও সুন্দরের রাজ্য।

পীতাম্বর সার্কাস পার্টি

॥ শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

ডিগ ডিগ ডিগা ডিগ! দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি!

বাজনা বাজিয়ে গাড়ীখানা এগিয়ে চলতে লাগল শহরের রাস্তা দিয়ে, আর ছুটে এল ছেলেমেয়ের দল। বুড়ো আর বয়স্করাও একবার না তাকিয়ে পারল না চলন্ত গাড়ীটার দিকে। অনেকে কৌতূহলী হয়ে এগিয়েও এল।

সার্কাস আসছে শহরে। সার্কাস।

এমন মজার ব্যাপার বহুদিন ঘটেনি এ শহরে। এখানকার ছোট ছেলেমেয়েরা কোনদিন সার্কাস দেখেনি। বড়রাও প্রায় ভুলে যেতে বসেছে।

তাই যখন পীতাম্বর সার্কাস পার্টির গাড়ী রাস্তায় ঘোষণা করতে করতে চলল তাদের সার্কাস আসছে এ শহরে, তখন সকলে যে আনন্দে মেতে উঠবে এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে!

গাড়ীর মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা 'পীতাম্বর সার্কাস পার্টি'।

আর তার সঙ্গে বাঘ, সিংহ আর নানা জন্তু-জানোয়ারের ছবি! গাড়ীর একপাশে বিজ্ঞাপনে লেখা :

আসুন! দেখুন!
এমন সুন্দর সার্কাস পার্টি কখনও হয়নি।
মজাদার খেলা। দেখুন এই বেলা।
সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।
প্রফেসর ঘনশ্যামের ম্যাজিক
আর
মাস্টার যদুনাথের বাঘের খেলা।

কয়েকদিন পরেই শহরের একপাশে রেল লাইনের ধারের এক মাঠে পড়ল পীতাম্বর সার্কাস পার্টির বিরাট তাঁবু। বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল চারিদিক।

সার্কাস পার্টির লোকজনও কম নয়। আর জন্তু-জানোয়ারও অনেক। একপাশে জায়গা হল সার্কাসপার্টির লোকজনের। লোকজনের মধ্যে সার্কাসের মালিক আর ম্যানেজার পঞ্চাননবাবু, প্রফেসর ঘনশ্যাম, তিনজন ভাঁড় অর্থাৎ ক্লাউন আর মাস্টার যদুনাথ। মেয়েদেরও আলাদা তাঁবু।

ম্যানেজার পঞ্চাননবাবুর মেয়েও আছে, সেও খেলা দেখায়। অন্য পাশে জন্তু-জানোয়ারের খাঁচা। দুটো হাতী, একটা বাঘ, কয়েকটা ঘোড়া, ছাগল, বাঁদর আর একটা ভালুক। এই হচ্ছে সার্কাসের সম্পত্তি।

খেলা আরম্ভ হওয়ার সময় সকলের আগে এসে দাঁড়ান পঞ্চাননবাবু। ইয়া লম্বা চওড়া দেহ। পাকানো গোঁফ। প্যান্ট আর কোট পরা। কোটের বুকে ঝোলে একগাদা মেডেল। হাতে ছড়ি।

পঞ্চাননবাবু এসেই বক্তৃতা করেন। লোককে খেলার কথা বুঝিয়ে দেন। এর পর হয় রিং আর ট্রপিজের খেলা। লোকে অবাক হয়ে দেখে কেমন দুজন লোক এ দড়ি থেকে সে দড়ি ধরে ঝুলতে থাকে। এরপর খেলা দেখাতে আসে পঞ্চাননবাবুর দশ বছরের মেয়ে। সরু তারের ওপর দিয়ে সে হেঁটে চলে সকলকে অবাক করে দেয়।

এইসব খেলার মাঝে মাঝে সকলকে হাসিয়ে চলে ক্লাউনেরা। অদ্ভুত পোশাক তাদের। মুখে সাদা রঙ মেখে তারা সঙ সেজে মজা করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

এরপর খেলা দেখায় হাতী আর ঘোড়া। তারপর আসে ভালুক। বাজনার তালে তালে ভালুক নেচে সকলকে অবাক করে দেয়। ভালুকের খেলার শেষে আসেন প্রফেসর ঘনশ্যাম। মিশমিশে কালো চেহারার লোকটি। মাথায় টুপী। প্রফেসর এসেই নানা রকম কসরৎ দেখান। এক বালতি মাছ শুদ্ধ জল খেয়ে ফেলেন—তারপর আবার সবটাই উগরে দেন। টুপীর মধ্য থেকে বের করেন পায়রা আর খরগোশ। লোকে অবাক হয়ে দেখে ঘনশ্যামের ম্যাজিক।

সব খেলার শেষে আসে বাঘের খেলা। পীতাম্বর সার্কাস পার্টির সবচেয়ে দামী আর জবর খেলা।

সার্কাসের সেরা জায়গাটি প্রথমে পরিষ্কার করে ফেলে লোকজন এসে। এরপর লোহার শিকের খাঁচা তৈরী হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে। ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ হয়। বড়রা বলে দেন 'এবার বাঘ আসবে!'

সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

কয়েকজন লোক টানতে টানতে নিয়ে আসে মস্ত একটা ঠেলা গাড়ীতে বসানো খাঁচা। সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখে বাঘ।

লোহার শিকের ঘেরা জায়গাটার মধ্যে এইবার বাঘকে ঢোকানো হয়। বাঘ বসে গর্জন করতে থাকে। তার গর্জনে ছোট ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

এবার আসে মাস্টার যদুনাথ। হাফপ্যান্ট আর হাফশার্ট পরা ষোল বছরের ছেলে। হাতে একটা ছোট ছড়ি আর মুখে হাসি। সকলে অবাক হয়ে দেখতে থাকে। কেমন অবহেলায় মাস্টার যদুনাথ বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকে যায়। আস্তে আস্তে বাঘের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বোলাতে থাকে।

সকলে ভাবে যদু-নাথের কি আশ্চর্য আর দুর্জয় সাহস।

যদুনাথ বাঘকে টুলের ওপর উঠতে বলে। বাঘ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করে। বাঘের মাথা দুহাতে জড়িয়ে ধরে যদুনাথ। লোকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এই ভাবে ঘন ঘন করতালির মধ্যে শেষ হয় সার্কাসের রোজকার খেলা।

শহরের লোক রোজ ভেঙে পড়তে লাগল পীতাম্বর সার্কাস পার্টির তাঁবুতে। সকলের মুখেই শুধু মাস্টার যদুনাথের প্রশংসা। শুনে শুনে গর্বে ফুলে ওঠেন ম্যানেজার পঞ্চাননবাবু। যদুনাথ তাঁরই আবিষ্কার। যদুনাথই যে পীতাম্বর সার্কাস পার্টির সব কিছু।

সার্কাসের দলে তাই যদুনাথ সকলের প্রিয়—শুধু একজনের ছাড়া। সে প্রফেসর ঘনশ্যাম। কেউ ঘনশ্যামের নাম করে না। সবাই যদুনাথের খেলা দেখার জন্যই আসে আর ধৈর্য ধরে শেষ খেলার অপেক্ষায় বসে থাকে।

মনে মনে হিংসেয় জ্বলে মরেন ঘনশ্যাম। মতলব আঁটেন কেমন করে ঐ যদুনাথকে তাড়ানো যায়।

একদিন সুযোগ মিলতেও দেরী হয় না।

সার্কাসের ক্লাউন হরিহর হঠাৎ কিছু টাকা চুরি করে পালায়। ম্যানেজার পঞ্চাননবাবু রেগে আগুন হন।

যদুনাথ ভালবাসত হরিহরকে। ম্যানেজার পঞ্চাননবাবুর কাছে যায় এবার যদুনাথ। বলে

'কাকাবাবু, হরিহরের মায়ের অসুখ, তাই বাধ্য হয়ে ও টাকা নিয়েছে। ও টাকা ও শোধ করে দেবে, ভাববেন না।'

পঞ্চাননবাবুকে যদুনাথ কাকাবাবু বলেই ডাকে।

পঞ্চাননবাবু রেগে ওঠেন আরও; বলেন, 'তুই থাম। টাকা দিয়ে দেবে। তুই সব জানিস্! ওকে আমি পুলিসে দেব।'

পঞ্চাননবাবুকে মন্ত্র দিতে থাকেন ঘনশ্যাম—'ঐ যদুনাথেরই মতলব এসব। বুঝলেন না? ও ভেবেছে ওর কথা আপনি শুনতে বাধ্য। ও না থাকলে আপনার সার্কাস অচল।'

ঘনশ্যামের কুমন্ত্রণায় যদুনাথের ওপর একটু একটু চটে উঠতে থাকেন পঞ্চাননবাবু।

দুদিন পরে যদুনাথ খবর পায় হরিহরের। হরিহর খবর দেয় ওকে টাকাটা ও দিয়ে দেবে। যদুনাথ যেন সব কথা বলে পঞ্চাননবাবুকে।

যদুনাথ পঞ্চাননবাবুকে বলে চিঠির কথা।

'চুপ! কোন কথা তোদের শুনতে চাই না' চেচিয়ে ওঠেন পঞ্চাননবাবু। 'ফের ওর হয়ে কথা বললে তোকেও দূর করব।'

পঞ্চাননবাবুর কথায় চোখে জল এসে গেল যদুনাথের। ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন পঞ্চানবাবু। বলে ওঠেন, 'দূর হয়ে যা তুই, সঙএর মত আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকিস্ না। তোরা দুজনেই চোর—হরিহর আর তুই।'

যদুনাথ এ ধরণের কথা আশাই করেনি। মনের দুঃখে ও তাড়াতাড়ি চলে আসে। বুকটা যেন ব্যথায় টনটন করতে থাকে ওর। নিজের জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়ে ও বেরিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্য থেকে।

আর ও থাকবে না সার্কাস পার্টিতে। কাকাবাবু ওকে চোর বললেন! এখনও ও ভাবতে পারছে না কথাটা।

আপন মনে ও পথ হাঁটতে থাকে।

পীতাম্বর সার্কাসের খেলায় আর লোক আসে না ক'দিন ধরে। যদুনাথ না থাকায় খেলা আর মোটেই জমছে না। ঘনশ্যাম নিজেই এবার বাঘের খেলা দেখাবেন বললেন পঞ্চাননবাবুকে।

যদুনাথ চলে যেতে এবার ভেঙে পড়েছেন পঞ্চাননবাবু। ছেলেটাকে ঐভাবে বকে ক'দিন ধরে মন খারাপ তাঁর। কত খুঁজেছেন যদুনাথকে তিনি পরদিন থেকে। কোথায় যেন উপে গেছে ছেলেটা। সত্যিই যে তিনি ভালবাসেন যদুনাথকে।

শেষ পর্যন্ত একদিন প্রফেসর ঘনশ্যাম বাঘের খেলা দেখাবেন বলে ঢুকলেন খাঁচায়। খাঁচায় ঢুকতেই ঘটে গেল বিষম কাণ্ড। প্রচণ্ড রাগে যেন বাঘ থাবা মারল প্রফেসর ঘনশ্যামের কাঁধে।

তারপরই হৈ-হৈ কাণ্ড। কোন রকমে ঘনশ্যামকে বাইরে এনে হাসপাতালে দেওয়া হল। পুলিসও এল। দর্শকরা ভয়ে একেবারে চুপ।

পঞ্চাননবাবু বুঝতে পারলেন বাঘ যদুনাথ ছাড়া আর কারও কথা শুনবে না। চোখে জল এল তাঁর। কিন্তু কোথায় গেল যে যদুনাথ। ছোট বয়স থেকেই যদুনাথকে মানুষ করেছেন পঞ্চাননবাবু। একটা অদ্ভুত মায়া পড়ে গেছে ছেলেটার ওপর। এবার তিনি বুঝতে পারলেন ঘনশ্যামই সব নষ্টের মূল। উচিত শাস্তিই হয়েছে লোকটার। এবার যদুনাথকে না পেলে সার্কাসই উঠে যাবে তাঁর। যে করেই হোক তাকে চাই।

বসে বসে ভাবছেন পঞ্চাননবাবু।

'কাকাবাবু' ডাক শুনেই চমকে উঠলেন পঞ্চাননবাবু। তাকিয়ে দেখলেন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে যদুনাথ আর হরিহর। যদুনাথ এসে পায়ের ধুলো নিল তাঁর।

'যদু তুই!' বলে পঞ্চাননবাবু একেবারে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। 'কোথায় গিয়েছিলি তুই?'

'হরিহরকে এখানে আনতে। সত্যিই ওর মার অসুখ ছিল। ওকে মাপ করুন।'—যদুনাথ বলে।

'আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। টাকাটা আমার কাছে চাইলেই তো পারত।' হাসিমুখে বলেন পঞ্চানবাবু।

পীতাম্বর সার্কাস পার্টির খেলা আবার জমে উঠল। যদুনাথের খেলা দেখতে আবার ভিড় করতে লাগল ছেলে বুড়ো সবাই।

পেনাং শহরের সুপারীর যাদু

॥ যাদুকর এ. সি. সরকার ॥

মালয় দেশের গা ঘেঁসে বঙ্গোপসাগরের বুকে ভাসছে পেনাং দ্বীপ। সুন্দর ছিমছাম সাজানো-গোছানো পেনাং শহর। মালয়ী, চীনা আর ভারতীয় এই হচ্ছে এখানকার অধিবাসী। সেবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এখানকার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কাছ থেকে। আমার এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাদু-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এঁরা।

প্রথম যেবার পেনাং যাই সেবার একটা ছোট খেলা দেখিয়ে অনেক সময় বেশ কৌতুককর পরিবেশের সৃষ্টি করতাম বন্ধুমহলে।

মালয়ী ভাষায় পেনাং শব্দের অর্থ সুপারী। এখানে প্রচুর ভাল জাতের সুপারী জন্মে

বলেই কি শহরটার এই নাম! সে যাই হোক শহরের নামের সঙ্গে পারিপাট্য রেখে সুপারী দিয়ে এক কৌতুককর ছোট যাদু-খেলা বানিয়ে নিয়েছিলাম।

পকেট থেকে একটা গোটা সুপারী বের করে আমি রাখতাম টেবিলের উপরে, তার পরে একটা ছোট প্লাস্টিকের রঙীন গ্লাস বের করে তা দিয়ে চাপা দিতাম ঐ সুপারী। 'হোকাস পোকাস গিলি গিলি' ··· মন্ত্র পড়ে যখন ঐ গ্লাস তুলে নিতাম তখন দর্শকেরা অবাক হয়ে দেখতেন গ্লাসের তলায় রাখা সুপারীটা মন্ত্রবলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

কেমন করে এই কাণ্ডটা করতাম এবার তাই বলে দিই। আমি আগে থেকেই গ্লাসের তলায় (ভেতরের দিকে) একটা গোটা সুপারী আটকে রাখতাম আটা দিয়ে। এমন ভাবে আটকাতাম যাতে অল্প ঝাঁকুনীতেই সুপারীটা খুলে পড়তে পারে। প্রথম সুপারীটা রেখে গ্লাস চাপা দেবার সময়ে আমি গ্লাসটাকে একটু জোরেই ঠুকে দিতাম টেবিলের উপরে। এর ফলে তলায় লাগানো সুপারী টুক্ করে খুলে পড়ে যেত টেবিলের উপরে অপর সুপারীটার পাশে।

এই এত সহজ কৌশলে কত ঝানু মানু বুদ্ধিমান লোক যে অবাক হয়েছিলেন তা বলে শেষ করা যাবে না। চেষ্টা করে দেখ তোমরাও অনেককে অবাক করতে পারবে।

বিজ্ঞান-পত্র

॥ সঞ্জয় ॥

দূরকে করিলে নিকট

না। আমি তোমাদের নতুন কোন সংবাদ দিচ্ছি না। ভবিষ্যতের মানুষ কি কি পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে খবরাখবর আদান-প্রদান করবে তারই দু'চারটে চমকপ্রদ তথ্য তোমাদের জানাতে চাই। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানের কল্যাণে সংবাদ পাঠানর ব্যাপারে যে সমস্ত আধুনিক পদ্ধতি কাজে লাগান হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা শুধু বিস্ময়ই সৃষ্টি করে না, তাদের কথা ভাবতে গেলে যেন মাথা গুলিয়ে যায়।

মানুষ একদিন নিজের কথা পরকে জানাতে শিখেছিল হাত-পা দুলিয়ে আকার-ইঙ্গিতে। পরে ভাষা সৃষ্টি হল। লেখার প্রচলন হল। মানুষের মুখে বা কাগজে লিখে সংবাদ আদান-প্রদান চলল কত যুগ। সে সংবাদ কখনও মানুষ বয়ে নিয়ে গেছে, কখনও বা ঘোড়ায়। রেলগাড়ী আবিষ্কারের পর মানুষ যেন হাতে স্বর্গ পেল। রেলগাড়ী কত তাড়াতাড়ি ডাক বয়ে নিয়ে যায়—দশ, পনের, কুড়িদিনের পথ এক দিনে—সে এক রীতিমত বিস্ময়ের পালা। তারপর আবিষ্কৃত হল টেলিগ্রাম, টেলিফোন, অবশেষে রেডিও-ফোন। আজ কলকাতা থেকে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের সঙ্গে কথা বলা যায় কোন আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায় গ্রামে গ্রামে আজ টেলিফোন বসেছে। ইচ্ছে করলে তোমার ঘরে বসেই সেই ফোনের সাহায্যে প্যারী, অথবা নিউইয়র্ক, মস্কো, যেখানে ইচ্ছে কথা বলে যেতে পারো।

সংবাদ আদান-প্রদান শুধু নিজেদের প্রয়োজনেই নয়, আরও নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অফিস-কাচারীর কাজে—দূর দূরান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। বিশেষ করে সংবাদপত্রের অফিসে তো নানা ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। এর জন্যে দেশ-বিদেশে হাজার হাজার মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা নানা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের লোক। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তাঁরা আতিপাতি করে খুঁজে থাকেন। নতুন খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সমস্ত কাগজের অফিসে পাঠিয়ে দেবার দায়িত্বও তাঁদের। এর জন্যে তাঁরা টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার যন্ত্র এমন কি মানুষ, ঘোড়া, কখনও কখনও পায়রারও সাহায্য নিয়ে থাকেন। টেলিপ্রিন্টার নামে কতকটা টাইপরাইটারের মত এক ধরণের যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রের সঙ্গে লাগান আছে কাগজ। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসা খবর আপনা থেকেই টাইপ হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি বেতার যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর অঞ্চল থেকে ছবিও পাঠানো হয়ে থাকে কাগজের অফিসে। আর এই সংবাদ এবং ছবি পাঠানর মস্ত একটা প্রতিযোগিতা পড়ে যায় সব সময়। প্রত্যেকেই চেষ্টা করে তারই পাঠান সংবাদ আগে যাক।

কিন্তু যাক বললেই তো আর যাওয়া নয়! যেমন, নিশ্চয় তোমরা লক্ষ্য করেছ তোমাদের কোন

আত্মীয় যদি দিল্লীতে থাকেন তাঁকে টেলিফোনে পেতে কখনও কখনও বুক করলে। তার পর বসে থাক কয়েক ঘণ্টা। তোমরা বিরক্ত হও। কলকাতা থেকে সরাসরি তো তুমি তারের মাধ্যমে কথা বলতে পার না।

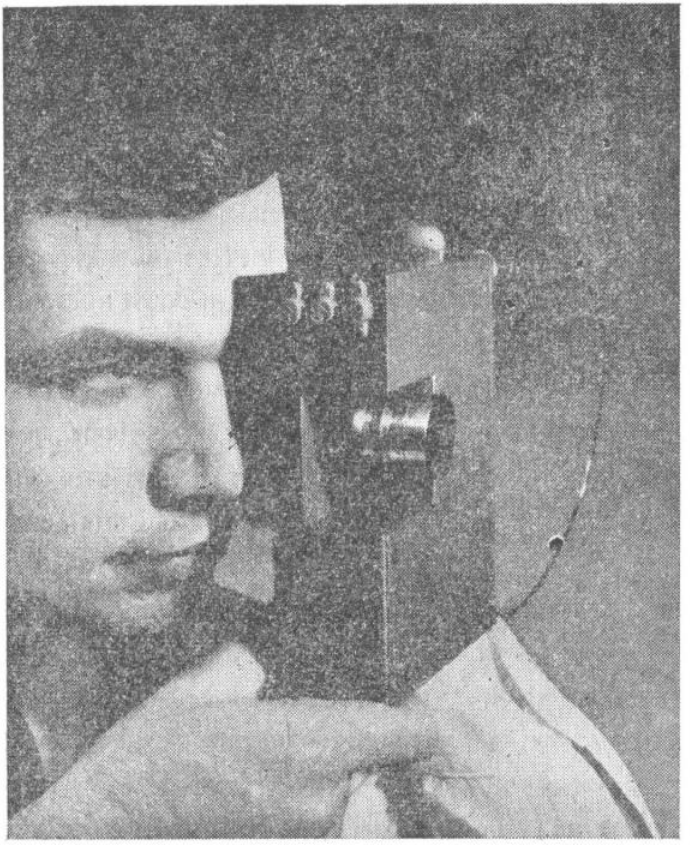

খুদে টেলিভিসন-ক্যামেরা-প্রেরক যন্ত্র: এটি তৈরী করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেডিও কর্পোরেশন। খুদে এই ক্যামেরার সাহায্যে যে কোন স্থানের ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠান সম্ভব কোন দূরাঞ্চলে। এর জন্যে ক্যামেরার নিচে ছোট্ট একটি ব্যাটারি চালিত ট্র্যানজিস্টার বেতার প্রেরক যন্ত্র আছে।

কত সময় লাগে? ট্রাঙ্ককল কিন্তু উপায় নেই। কারণ মাঝে অনেকগুলি স্টেশন থাকে। তোমার সঙ্গে তাদের যো গা যো গ করতেই সময় লেগে যায় প্রচুর। তার ওপর মাঝ থেকে কেউ যদি কথা চালিয়ে যান, তা হলে বসে থাক চুপ চাপ। সম্প্রতি বেতারে আমাদের দেশের মধ্যে সংবাদ লেন-দেনের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে কোন কোন জায়গার মধ্যে খুব কম সময়ে সংবাদ আদান-প্রদান করা সহজ হয়েছে। কলকাতা থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে এখন যোগাযোগ করা সোজা।

কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষ আরও ব্যস্ত। তাদের কাজের চাপ থাকবে অনেক বেশী। তাই সে দিনের জন্যে সংবাদ লেন-দেনের ব্যবস্থা আরও দ্রুত গতি সম্পন্ন করতে হবে। এর জন্যে কাজও শুরু হয়ে গেছে। যেমন ধর, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আমরা এমন উড়োজাহাজ পাচ্ছি যাদের গতিবেগ ঘণ্টায় চারহাজার মাইলেরও বেশী হতে পারে। ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত

থেকে অপর প্রান্তে একদিনেই তোমার চিঠি পৌঁছে যাবে। এ ছাড়াও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সংবাদ বা ছবি আদান-প্রদানের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এরই মধ্যে টেলস্টার, রিলে-১, সিনকোম প্রভৃতি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠান হয়েছে মহাকাশে। এরা নিয়ত পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমন করছে। পৃথিবীর কোন স্টেশন থেকে কোন সংবাদ বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে প্রথমে এই সমস্ত উপগ্রহে পাঠান হয়। পরে সেখান থেকে তা গন্তব্য স্থানে এগিয়ে যায়। এর ফলে আজ নিউইয়র্ক থেকে অস্ট্রেলিয়ার যে কোন স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা মুহূর্তের মধ্যেই সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে 'ল্যাসার' নামে বিশেষ প্রণালীর আলোকরশ্মির দ্বারাও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হচ্ছে। সাধারণ আলোকে রশ্মিগুলি বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করে। কিন্তু ল্যাসারে ঐ একই রশ্মিকে পুরোপুরি সমান্তরাল পথে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এটাই 'ল্যাসারের' প্রণালী। এর ফলে আলোর ক্ষমতা এত বৃদ্ধি হয় যে তা দিয়ে পুরু লোহার পাতকেই এক পলকে কেটে ফেলা যেতে পারে।

শরীরচর্চার বৈঠক

॥ বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় ॥

আমার স্নেহের সব ভাইবোনেরা,

বল কেমন আছ? বাংলার আকাশে আজ নতুন উষার আলো দেখা দিল। ভোটপর্ব শেষ। জয়-পরাজয় প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলা শাসনের দায়িত্ব পেল অকংগ্রেসী দল। প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করলেন আমাদের দেশের সর্বদল-প্রিয় নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি। অজয়দা ভারি ভাল মানুষ। এক কথায় বলা যায় একটা গোটা মানুষ।

অজয়দা বলেছেন—দেশের অন্ন, বস্ত্র, বেকার ও শিক্ষা-সমস্যা প্রথমে দূর করতে হবে। আমি পাল্টা বলেছি—একটা বাদ দিয়েছেন, সেটা জনস্বাস্থ্য। ওটাকেও নতুন ছাঁচে গড়তে হবে—তবেই দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য অনেকাংশে লাঘব হবে। হেসে বললেন তিনি—তার জন্য তো তোমরা আছো ভাই। যেমন ভাল বুঝবে সরকারকে আদেশ করবে।···

কথার সুর ও ছাঁচে মনটা ভরে গেল কানায় কানায়। আমার একটা অনুরোধ যাঁরা গত কয় বছর শাসনের দায়িত্বে ছিলেন মানে কংগ্রেস দল—তাঁদের প্রতি যেন কখনো খারাপ মনোভাব পোষণ করো না তোমরা। মনে রেখো—স্বাধীনতার পর থেকে তাঁরাই দেশবাসীকে কমবেশী খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এই দেশের মাটিতে। অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

শোন, ভাল কথা—তোমাদের শিশুমনে দেশটাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবার বিশেষ কোন পরিকল্পনা যদি আসে বা কারো কাছ থেকে পাও, আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি—বিনা দ্বিধায় তা তোমরা Govt. of West Bengal, Writers' Building—প্রধান মন্ত্রী অজয়দার কাছে সরাসরি লিখিতভাবে পাঠিয়ে দেবে। দেখবে নিশ্চয়ই সাড়া পাবে। কে কি পাঠাচ্ছ তার একটা Copy আমায় দেবে। যদি প্রয়োজন হয় আমি তোমাদের প্রতিনিধি হয়ে স্বয়ং মহামান্যের দপ্তরে গিয়ে ধন্না দেবো—কেমন খুশী তো ?

একটু রাজনীতির কথা বলা হলো—চল এবার আমরা আমাদের আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিই।

শোন, আগের এক সংখ্যায় বলেছিলাম—শ্রীমা-শ্রেষ্ঠদেহী প্রতিযোগিতা হবে নিউ টালিগঞ্জে —তা হয়ে গেছে। চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন আমাদের ইউনিভারসিটি ল' কলেজের ২৪ বছরের ব্যায়ামী ছাত্র শ্রীতপন মণ্ডল। খুব ভাল চেহারা তাঁর। এর আগে গত ৯ই ডিসেম্বর Mr. Indiaতে নিজ বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন। বর্তমানে আমার কাছে নিয়মিত ভাবে অনুশীলন করছেন এসিয়াশ্রী প্রতিযোগিতার জন্য।

এবার আছে ৫ই মার্চ বাগবাজার জিমনাসিয়ামে বিকেলে Junior Mr. India প্রতিযোগিতা —ফলাফল পরের সংখ্যায় দেব।

১২ই মার্চ আছে বজ্‌বজ্‌শ্রী শ্রেষ্ঠদেহী প্রতিযোগিতা—তারপর ১লা ও ২রা এপ্রিল হবে ভবানীপুর ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে যতীন দাস ব্যায়ামাগারে কলিকাতাশ্রী, দক্ষিণ কলিকাতাশ্রী, Mr. Strong man and Mr. Muscle man of Calcutta 1967 প্রতিযোগিতা। তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল দেখতে ও যোগদান করতে। বিশেষ কোন বিবরণ জানতে চাইলে আমার বাড়ীর ঠিকানায় 51 B, Ramkanta Bose Street, Cal.-3. [ফোন 55-8201] যোগাযোগ কর সত্বর।

আচ্ছা ভাল কথা—গত সংখ্যার প্রশ্নের জবাবগুলি সব ভাল করে পড়েছো তো ? একটি খাবার তৈরীর প্রণালী ছিল—তৈরী করেছিলে ? লাগলো কেমন ? সংবাদ দেবে। এবার আর খাবার কিছু শেখাবো না, আগে আমায় জানাও লাগলো কেমন ? তোমাদের উৎসাহ-আগ্রহ দেখে বুঝে তারপর আবার নতুন প্রণালী দেবো। রাগ করলে না তো ?

এবার তোমাদের কিছু চিঠিপত্রের জবাব দিচ্ছি—বেশ মন দিয়ে পড়বে।

অশোক সরকার (কাটোয়া)। প্রঃ—ব্যায়াম করি কিন্তু পেটের গণ্ডগোল খুব আছে। বলুন তো কি খাবো আর আসন করবো ?

উঃ—সকালে দই আর বেলের পাতলা সরবত করে খেয়ো ; দুপুরে সুক্তো, জ্যান্ত মাছের ঝোল, ডালের জল আর দই-ভাত ; বিকেলে দুধ-চিঁড়া, রাত্রে ঝোল-ভাত খাবে। আর স্নানের সময় তেল মালিশ করবে। আসনের দিক থেকে আপাততঃ ভূজঙ্গাসন, বিপরীতকরণী মৎস্যাসন, যোগমুদ্রা এই আসনগুলি ৪।৫ বার করে সকালে বা সন্ধ্যায় করো।

পার্থ চৌধুরী (বেনারস)। প্রঃ—টাইফয়েড থেকে ওঠার পর আমার মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, কি করবো ? আমার বয়স ৬ বছর।

উঃ—কোন ওষুধপত্র খেয়ো না এর জন্য। আমারও একবার হয়েছিল অমন। ভাল খাওয়া-দাওয়া করো নিয়মমত। মাথায় রোজ তেল লাগিয়ে যাও—সময় মত ঠিক চুল উঠতে থাকবেই। ভিটামিন 'সি'-যুক্ত খাদ্য একটু বেশী খেয়ো।

প্রদীপ রায় চৌধুরী (আসাম)। প্রঃ—মানুষের কতটুকু ঘুমানো উচিত ?

উঃ—সবার একরকম নয়, মানুষের শ্রম বিশেষে বিচার করতে হয়। তুমি কার কথা বলছো ?

প্রঃ—বুক হাত শরীরের অন্য অংশ থেকে ছোট হলে কি করতে হবে ?

উঃ—ইটের ওপর "ব" আকারে বুকডন দিতে হবে।

প্রঃ—মনকে কেমন করে দৃঢ় করা যায় ?

উঃ—সত্য-সঙ্কল্প-সুস্থ ও শ্রদ্ধার সাধনা করলে মন দৃঢ় হতে বাধ্য।

প্রলয় বসু (বজ্‌বজ্‌)। প্রঃ—আমার শরীরের মাপ উচ্চতা ওজন এবং খাদ্য-তালিকা পাঠালাম, এবার দয়া করে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

উঃ—শোন আমি ১২ই মার্চ তোমাদের পাড়ায় "বজ্‌বজ্‌শ্রী" প্রতিযোগিতা করতে যাচ্ছি, তখন দেখা করো—নিশ্চয়ই তোমায় ওখানে Chart দিয়ে দেবো।

শুভা দাসগুপ্তা (দার্জিলিং)। প্রঃ—চোখের দোষের জন্য মাথা ধরছে—কি করি বলুন তো ?

উঃ—সত্বর চক্ষু পরীক্ষা করে চশমা নাও। অন্য গতি নেই।

থাক আজ আর নয়, আবার আসছে বার দেখা হবে তোমাদের সাথে। ভাল কথা, যেসব অনুরোধগুলি এবার করলাম যেন পালন করতে ভুলে যেও না। প্রীতি ও ভালবাসা রইলো। ইতি

—তোমাদের মনতোষদা

খেলাধূলা

॥ শ্রীঅমিতাভ ॥

কেউ কোনদিন জানতেও পারত না সেই নামটি, দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে ময়দানে শুধু নামটি প্রতিধ্বনিত হয়েই ফুরিয়ে যেত। অজান্তে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ত সুন্দর ফুলটি। সত্যিই বিশ্ব-ক্রিকেট হারাত একটি সাচ্চা হীরেকে। বেসিল ডি ওলিভিয়েরা যে আজ ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের অমূল্য রত্ন একথা প্রত্যেকেই দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করবে।

আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার এক অখ্যাত মিশ্রিত পরিবারে ওলিভিয়েরার

জন্ম। আমাদের দেশে যেমন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার, ওলিভিয়েরাদের পরিবারও ছিল এমন একটি পরিবার। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় শাসন নরকের চেয়েও জঘন্য। সাদা আর কালোর মাঝে এই শাসকেরা প্রায় স্বর্গ-নরকের ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। একমাত্র শ্বেতকায় এবং খাঁটি শ্বেতাঙ্গের রক্তের ধারকই দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষ বলে স্বীকৃত। অন্যান্য লোকদের ভাগ্যে সেখানে চরম লাঞ্ছনা, সীমাহীন অপমানের জ্বালা।

যেহেতু অশ্বেতকায় বংশে ওলিভিয়েরার জন্ম, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি বঞ্চিত হলেন সমস্ত অধিকার থেকে। কালো ছেলেদের সেখানে ক্রিকেট শেখার কোন সুযোগই নেই। কিন্তু প্রতিভার আদরের দুলাল বেসিল ওলিভিয়েরা জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার হয়ে। ছোটবেলায় কেউই তাঁকে হাত ধরে শেখায়নি ক্রিকেট খেলার কায়দা-কানুন, নিজের হাতে আপনা থেকেই তিনি ব্যাট আর বল হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ওলিভিয়েরা সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে নিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন. আপন প্রচেষ্টায় সহজাত প্রতিভার বলে গড়ে তুলেছেন নিজেকে।

জীবনের মূল্যবান পঁচিশটি বছর ওলিভিয়েরার কেটেছে দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে। মাত্র আঠার বছর বয়সেই তরুণ ওলিভিয়েরা অশ্বেতকায় খেলোয়াড় হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হন। কিন্তু এরপর তিনি দেখলেন যে সামনে তাঁর পথ রুদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকলে ধীরে ধীরে তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের অপমৃত্যু ঘটবে। দক্ষিণ আফ্রিকার মৃত্যু-গহ্বর থেকে তিনি ছিটকে বেরোবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। নানান জায়গায় চিঠি লিখতে লাগলেন, কিন্তু সুযোগ পাওয়া দুষ্কর। কেই বা চেনে দক্ষিণ আফ্রিকার এই অমূল্য রত্ন বেসিল ডি ওলিভিয়েরাকে। অবশেষে সুযোগ তিনি পেলেন, ডাক এল ইংলণ্ডের মিডলটনের কাছ থেকে। পঁচিশ বছর বয়সে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ওলিভিয়েরা ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে মাত্র আঠার বছর বয়সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করেন একবার ওলিভিয়েরা। দলীয় ২৩৩ রানের মধ্যে একাই ২২৫ রান আর এর মধ্যে ছিল আটাশটি ওভার বাউণ্ডারী। ডাবল সেঞ্চুরী করতে তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র নব্বুই মিনিট। আর একবার একটি খেলাতে তিনি আর এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছিলেন। আট বলের একটি ওভারে সংগ্রহ করেছিলেন ছেচল্লিশ রান। পরপর ছটি বল পাঠিয়েছিলেন ওভার বাউণ্ডারীতে, সপ্তম বলে বাউণ্ডারী আর শেষ বলে আবার ওভার বাউণ্ডারী। দীর্ঘ ছটি ক্রিকেট মরশুম ওলিভিয়েরার জীবনের কেটেছে ইংলণ্ডের মাটিতে। ১৯৬৬ সাল তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের স্মরণীয় মরশুম। ইংলণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট-ইণ্ডিজদলের বিপক্ষে তিনি প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ লাভ করেন লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে। ওই বছরই ওলিভিয়েরা বিশ্ব-ক্রিকেট একাদশের বিপক্ষে ইংলণ্ডের হয়ে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করেন। এবছর বার্বাডোজ একাদশের বিপক্ষে বিশ্ব একাদশের পক্ষে খেলার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। আজ বেসিল ডি ওলিভিয়েরা ইংলণ্ডের সেরা অলরাউণ্ডার হিসাবে

স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ব্যাট হাতে পিটিয়ে খেলতে ওস্তাদ ওলিভিয়েরা, সুন্দর মিডিয়াম পেস বোলিং করতে পারেন। বেসিল ডি ওলিভিয়েরাকে নিয়ে ইংলণ্ডদল যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে আগামী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য সে খবর তোমাদের পূর্বেই দিয়েছি। ইংলণ্ডে "ডলভেরা" নামে খ্যাত ওলিভিয়েরাই একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকান অশ্বেতকায় খেলোয়াড় যিনি টেস্ট খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কে জানে দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে ময়দানে "ডলভেরার" মত কত অজানা প্রতিভা অজান্তে ঝরে যাচ্ছে।

বেসিল ডি ওলিভিয়েরার কাহিনী শোনালাম তোমাদের, এবার অন্যান্য খেলাধূলার খবরাখবর জানাচ্ছি।

অবশেষে সরকারীভাবে বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ানের সম্মান লাভ করলেন মহম্মদ আলি ক্লে আর্নি টেরেলকে পরাজিত করে। এতদিন বেসরকারীভাবে ক্লে ছিলেন চ্যাম্পিয়ান, আর বিশ্ব বক্সিং সংস্থা টেরেলকে চ্যাম্পিয়ান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। টেরেল ক্লের সঙ্গে পনেরো রাউণ্ড পর্যন্ত লড়েন। মহম্মদ আলি ক্লে আজ পর্যন্ত পেশাদার হিসাবে লড়েছেন আটাশটি লড়াই এবং এখনও পর্যন্ত তাঁর অপরাজিত আখ্যা বজায় রেখেছেন। মার্চ মাসের বাইশ তারিখে ক্লে নিউইয়র্কে লড়বেন জোরা ফোলীর সঙ্গে।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সন্তোষ ট্রফির খেলায় ভারতীয় রেলদল ফাইন্যালে ২—০ গোলে সার্ভিসেসকে পরাজিত করে তৃতীয়বার সন্তোষ ট্রফি জয়ের সৌভাগ্য লাভ করল। ইতিপূর্বে ১৯৬১ সালে এবং ১৯৬৪ সালে রেল দল জাতীয় ফুটবলে বিজয়ী হয়। ফাইন্যালের প্রথম দিনের খেলা কিন্তু অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

সদ্য পদ্মভূষণ সম্মান প্রাপ্ত ভারতীয় টেনিস তারকা রমানাথন কৃষ্ণান লাভ করলেন আর এক নতুন সম্মান "হেলমস ট্রফি"। ১৯৬৬ সালে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসাবে কালিফোর্ণিয়ার হেলমস স্পোর্টস ফেডারেশান কৃষ্ণানকে এই সম্মান প্রদান করেছেন। ইতিপূর্বে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক হকি বিজয়ী ভারতীয়দলের অধিনায়ক কে ডি সিং (বাবু) এবং উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং এই ট্রফি লাভ করেছেন।

মার্চ মাসে বার্বাডোজে বিশ্ব-ক্রিকেট একাদশ এবং বার্বাডোজ একাদশের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের টেস্ট খেলোয়াড় চান্দু বোরদে এই বিশ্ব একাদশে খেলার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।

রঞ্জী ট্রফির কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় ইডেন উদ্যানে বাংলাদল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ভারতীয় রেলদলকে পরাজিত করেছে। সেমিফাইন্যালে বাংলাদল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে রাজস্থানের সঙ্গে ইডেন উদ্যানে।

নতুন ধাঁধা

॥ শ্রীঅবিনাশ চৌধুরী ॥

নীচের ছড়াটির কতকগুলি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দেখ তো, তোমরা ছড়াটিকে মেলাতে পারো কি না! ছড়াটির চরণগুলির মিল হবে কিন্তু একই শব্দ ব্যবহার করে। যেমন—

হাঁড়িতে তয়ের করে রেখেছি কচুরি,
দেখো যেন কেউ এসে করে না কো চুরি।

১। বনপথে শুনি যেন বাঁশী কে —,
এত রাতে বুঝি না এ পথে কে —।

২। বাপমায়ে ভাল নাম রেখেছে —,
রোজ শুনি, এটা সেটা কত কি —।

৩। 'সুরুচির' রুচি মোটে হয় না কো —,
অজীর্ণ রোগে তার এ কি দশা —।

৪। খেয়েছে ওষুধ কত, ইপিকাক —,
অসুখটা কিছুতেই সারতে যে —।

৫। ভোল পালটেছ আজ পড়ে তুমি —,
বুঝেছি আমি তা বেশ, ফাঁকি দেবে —।

৬। চুল কাটে, নখ কাটে, দাড়িটা —,
নাপিত মশায় বেশ পয়সা —।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

শখ

উত্তরদাতাদের নাম

অরুণ বসু (২০৫৪৫); সতীশ ও অঞ্জন (নরসিংগড়); অঞ্জন ও হরিসাধন (বাঁকুড়া); জয়ন্ত, সুব্রত, সৌমেন্দ্র প্রভৃতি (মালদহ); মোহনলাল কাপড়ী (১৫২৬৫); স্নিগ্ধা ও সলিল (২০৩৭১); রঞ্জিত-কুমার সিংহ (১৫১৮৪); কল্যাণ মিত্র (কলিকাতা); পরেশ মোদক (১৭৪৫১); শঙ্কর রানা (১৩৭২৬); দিলীপ চাটার্জী (বীরভূম); কল্যাণী, সাবিত্রী, সুচেতা (১৯৮৪৬); অশোক, অনিল, অমিয়, অরবিন্দ (১৮৮৩২); হীরালাল মণ্ডল (পুরুলিয়া); জ্ঞান ও ছন্দশ্রী হালদার (১৬৭৭২); আবদুল ফাইউম (বীরভূম); উৎপল ও কল্যাণ ভট্টাচার্য (কলিকাতা); তপন ও স্বপন কর্মকার (রাঁচী); বিমলকুমার ভড় (২০২৩৩); রাকা বসু (১০৮১৮); আশীষকুমার ভূঞা (২০৮৪২); বরুণকুমার পাণ্ডে (১৮৬৯৮); স্বপন কুমার নন্দ (২০১৬৮); শিবানী, কল্যাণী ও দেবাশীষ (১৮৯৯৫)।

সম্পাদিকার চিঠি

ছোট বন্ধুরা,

আজকের চিঠি ১৩৭৩ সালের শেষ চিঠি। ১৩৭৪ সালের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তার আসার আর দেরী নেই।

প্রতি বছরই একদিন নূতন করে আবির্ভূত হয়। তারপর বারোটা মাসের কান্না-হাসির পালার শেষে আসে বিদায়ের মুহূর্ত। আবার সেই সন্ধিক্ষণেই নতুন দিনের আভাসে রঙ্গীন হয়ে ওঠে পূর্বাচল। চৈত্রের ঘূর্ণি-হাওয়ার সাথে সাথে দূর থেকে দূরে চলে যায় পুরাতনের যত গ্লানি আর জঞ্জাল। এই নিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে ইতিহাস। মহা মূল্যবান আর আশ্চর্য ইতিহাসের বিষয়বস্তু আমাদের এই প্রতিদিনের চেনা ক্ষণগুলি।

সম্প্রতি আমাদের দেশে নির্বাচন-পর্ব শেষ হয়েছে। নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। বাংলা দেশে এই প্রথম অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা দেশের শাসনভার নিয়েছেন। মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিসভাকে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশবাসী স্বচ্ছন্দে খেয়ে পরে শান্তিতে বাঁচুক, এই আজ আমাদের প্রার্থনা।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রথম বেতার-ভাষণে বলেছেন,—"জনগণের সীমাহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ও প্রীতির অভিব্যক্তি দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। * * * আমরা খোলা চোখ ও মন নিয়ে কাজ করতে চাই। * * * আমরা চাই অপব্যয় নিবারণ করতে, দুর্নীতি ও কর্মদক্ষতার অভাবের নিবারণ করতে। * * * আমরা শুধু দেখতে চাই ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের চেয়ে জাতীয় কল্যাণের দিকে যেন এই ধরণের কার্যাবলীর লক্ষ্য বেশী পরিমাণে থাকে।"

নূতন মন্ত্রিসভার সামনে রয়েছে নানা রকমের সমস্যা। সে সব সমস্যা সমাধান করতে হলে দেশবাসীকেও সহযোগিতা করতে হবে। গত কুড়ি বছরের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের কাজে দেশবাসীর দায়িত্বও কিছু কম নয়।

দেশের সমস্যা সমাধানে ছোটদেরও মস্ত বড় দায়িত্ব আছে; এ কথা তোমরা ভুলো না। শিশুকাল থেকে তোমরা সৎ নাগরিক হবার চেষ্টা করো। সেজন্য তোমাদের হতে হবে নিয়মানুবর্তী, পরিশ্রমী ও বিনয়ী। উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যায় ও অসত্য যেন তোমাদের সততার কাছে মাথা নীচু করে থাকে।

আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক হবার জন্য তোমরা যদি এখন থেকেই সচেতন হয়ে চলতে পারো, সেটাই হবে দেশনেতাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন।

আজকের চিঠি এখানেই শেষ হোক। আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নূতন বছরে। এই সঙ্গে তোমাদের জানাই যে বার্ষিক পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবার জন্য শ্রীমান অশ্বিনীকুমার ত্রিপাঠীকে (গ্রাঃ নং ১৬৩৩৭) আগামী বছরের শিশুসাথী উপহার দেওয়া হবে।

আমার প্রীতি ও শুভকামনা জেনো তোমরা।

শুভার্থিনী
তোমাদের সম্পাদিকা।

পার্থসারথি স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল

১ম পুরস্কার—১০ টাকা দামের বই পাবে চন্দন দাশগুপ্ত, গ্রাঃ নং ২০৭৬৩

২য় পুরস্কার— ৫ টাকা দামের বই পাবে বীরবাহু সাহা, গ্রাঃ নং ১৫৩৯১

৩য় পুরস্কার— ৩ টাকা দামের বই পাবে কামাল হোসেন, গ্রাঃ নং ২০৭৭৬

সম্পাদিকা—শ্রীমতী দাশগুপ্ত
৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

শিশু সাথী

(সচিত্র মাসিক পত্র)

৪৫শ বর্ষ

১৩৭৩

আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	অ	
অন্ধকারে জলার ধারে	সুবীর চট্টোপাধ্যায়	২৬
অমিয় বনাম বিজন	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৭২
অমৃত সরোবর ও স্বর্ণমন্দির	শ্রীসুলেখা চক্রবর্ত্তী	৫৬০
	আ	
আজব ফলের মেলা (কবিতা)	শ্রীহরিবিষ্ণু সরকার	২৩
আবাহন (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১
আমন্ত্রণ (কবিতা)	বন্দে আলী মিয়া	৫৩৭
আমাদের পানীয়—কফি	শ্রীঅমরনাথ রায়	৭১৬
আমি আমার কর্তব্য করেছি	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত	১৪১
আরও কি কি খাওয়া চাই	ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য	৪৮০
	ই	
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি	শ্রীঅতসি সেন	৩৬৭
	উ	
উত্তরদাতাদের নাম		২০৪, ২৪৭, ৩৩৮, ৪০৩, ৫৩৫, ৫৯২, ৭২৬, ৭৮৬
উত্তরাধিকার		২২৯, ৩১৭, ৩৭২, ৪৬২
উত্তুরে বাতাসের গল্প	শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	৬২১
উল্কা	শ্রীসুখরঞ্জন রায়	৪৯১
	এ	
এই আশ্বিনে (কবিতা)	শ্রীঅতীন মজুমদার	৩৪১
একজন চালাকের গল্প	ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী	৯৩
একটা কিছু কর (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৭
একটি অধ্যায়ের কাহিনী	শ্রীসাবিত্রী সেনগুপ্তা	৬১০
একটি প্রতিভা	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস	১০১
একমুঠো (কবিতা)	শ্রীপরিচয় গুপ্ত	৫৭৪

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
এ কালের ছড়া (কবিতা)	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়	২৭৮
এমো	শ্রীবসন্তকুমার কবিরাজ	৪৯৮
	ক	
কঠিনে-কোমলে	শ্রীবারীন মৈত্র	৪২১
কবিতাবলী (কবিতা)	শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	২২১
কবিতার ধাঁধা	শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র	১৩৭, ৫৩৪
কলকাতার বর্ষায় ভানি (কবিতা)	শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	২৩২
কার্টুন	শতদল	১৯০
কাঁঠাল পাখী	বি. দে	৩৯০
কানে তুলোর দেশে	শ্রীশিশির মজুমদার	৩০২
কুপকুপ	শ্রীগৌরী চৌধুরী	১৫, ৮০, ১৬৩, ২৩৩, ২৭৯, ৩৬৩, ৪৯৪, ৫৩৮, ৫৯৯, ৬১৮, ৭৩০
কুয়েলালামপুরের ডলার পোড়ানোর যাদু	যাদুকর এ. সি. সরকার	১২০
কেম্ব্রিজের দড়ির ম্যাজিক	যাদুকর এ. সি. সরকার	৪৬০
কৃতজ্ঞতা (কবিতা)	শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৪২
ক্ষমা চাই না	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১০
	খ	
খুকুর মাষ্টারি (কবিতা)	শ্রীকার্তিক ঘোষ	৬৫৩
খেঁকি	মুরারীমোহন বিট	৪৪৭
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৬৭, ১৩৫, ২০১, ২৭৩, ৩৩৬, ৪০১, ৪৬৬, ৫৩৩, ৫৯০, ৬৫৬, ৭২৪, ৭৮৩
খোকা আর খুকু (কবিতা)	শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	৭২০
খোকা-পালোয়ান	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	৫১৯
খোকা যাবে চাঁদের দেশে (কবিতা)	শ্রীসরল দে	১৬২
	গ	
গত মাসের ধাঁধার উত্তর		৫০, ২০৪, ২৪৭, ৩৩৮, ৪০৩, ৫৯২, ৭২৬, ৭৮৬

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	ঘ	
ঘুড়ি যদি আটকায় (ছড়া)	শতদল	৪১২
	চ	
চড়াইকে : খুকু (কবিতা)	শ্রীকার্তিক ঘোষ	৭৩৪
চন্দ্রকেতু গড়	শ্রীশান্তিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৮
	ছ	
ছড়া		
আর কেঁদো না	শ্রীরথীন সরকার	২৪২
চড়ুইয়ের সাজা	শ্রীবরেন রায়	৩১৮
ছড়া	শ্রীমতী	৪৬
ছড়া	শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩১৮
ছড়া	শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত	৩৭৩
ছড়া	শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত	৬৩৫
ছড়া	শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়	৭০৬
বোম্বেটে	শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত	১৮২
ল্যাংতুয়া	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু	৩৭৩
হাট্টিমা টিম পাখী	সাজ্‌জাদ উদ্‌দীন আহ্‌মদ	১১৩
ঢাক গুড়গুড়	শ্রীসরল দে	৭৬৯
যা কবিতা মিলে যা	শ্রীশৈলশেখর মিত্র	৭৬৯
ছবির ধাঁধা		৬৬
ছেলেবেলার অভেদানন্দ	সন্ন্যাসিনী যোগদাপুরী	৪৩৪
	জ	
জন্ম যদি (কবিতা)	শ্রীবরুণ বিশ্বাস	৫৮৬
জলের ম্যাজিক	যাদুকর এ. সি. সরকার	৩২৭
জষ্টি এল (কবিতা)	শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ	৭১
জাতক কাহিনী	জয়ন্তী সেন	৪২
জাপানের চিঠি	পি. সি. সরকার	৫৬, ১১০, ১৮৫, ৬১৮
জীবজগতের বুদ্ধিবৃত্তি	শ্রীঅতসি সেন	৭৬৩
	ট	
টুনটুনি (কবিতা)	শ্রীহিমকর গোস্বামী	৭৫৪

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	ড	
ডানপিটে বিবেকানন্দ	শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৯৬
ডিটেকটিভ রতন-হিতেনের কীর্তি	শ্রীপরিমল গোস্বামী	৫১
ড্রাগন বধ	শ্রীহরিবিষ্ণু সরকার	৬৫০
	ত	
তিন পুতুলের ছড়া (ছড়া)	কার্তিক ঘোষ	৪১১
তিব্বতের কথা	শ্রীসঞ্জীবকুমার নন্দী	২৬৮
তেনালিরামের তামাশা	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	৭১৭
তেলের তালিকা (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬২
তোমরাও করতে পারো	শ্রীসুনীল সরকার	২৩০
তোমাদের পাতা		
আগমনী (কবিতা)	শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু	৩৭৪
আত্যিকালের বত্যিমশাই (কবিতা)	শ্রীকেয়া বসু	৩৭৮
আমি কবি (কবিতা)	শ্রীঅমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়	২৪৫
ঋতু হেমন্ত (কবিতা)	লুৎফর রহমান খান্	৫৭৭
এক রাতের ভূত	করবী গুপ্ত	১১৪
এসেছে পৌষ-পার্বণ (কবিতা)	শ্রীসুভাষকুমার মণ্ডল	৬২৭
কিশোর (কবিতা)	শ্রীচন্দ্রশেখর গোস্বামী	৩২২
খুকুর বায়না (কবিতা)	শ্রীরণিতা ঘোষ	৭০৯
জন্মদিন	কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়	৪৯
জিভকাটা চড়ুইটি	ছন্দা দিন্দা	১১৮
ঝগড়া করতে নেই	শ্রীবলীন্দ্রকুমার বৈদ্য	৭০৭
তাঁতি-বৌ	জবা গুপ্তা	৫১৩
দি ক্লোক	শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত	২৪৩
দি বেট	শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত	৪৭
দুঃখ	শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত	৫৭৫
নববর্ষে (কবিতা)	স্বরূপকান্তি মুখোপাধ্যায়	৪৯
নবীন সাথী (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন মালাকার	১৮৪
পার্থসারথি স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা	শ্রীচন্দন দাশগুপ্ত	৭৭১
বর্ষাদিদি (কবিতা)	শ্রীমণিকা মৈত্র	২৪৬
বাপ ও ছেলে (কবিতা)	আবৃতুল্লাহ্-আল্-হাসান	৫১৫
ভোর হয়েছে (কবিতা)	মৃগেন্দ্রকুমার বেরা	১১৭
রাঙ্গামশাই (কবিতা)	শ্রীরানু সাহা	১৮৩

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
শিল্পনগর দুর্গাপুরে আমরা	শ্রীজয়ন্তী রায় চৌধুরী	৩১৫
শিশু-সাথী (কবিতা)	মহম্মদ রায়হান আলী খাঁন	৭১০
শ্রদ্ধাঞ্জলি	শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু	৩১৯
সমব্যথী	শ্রীউৎপল সান্যাল	৬৩৬
হাতীর লড়াই	শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১০
	দ	
দামাল হাওয়ার রাতে (কবিতা)	শ্রীশোভাময় নাথ	৩৫২
দীপান্বিতায় (কবিতা)	শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯০
দীপান্বিতা রাতে (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	৪৪২
দেবেশ্বরের মুক্তিলাভ	শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম	২২২
	ন	
নতুন ধাঁধা	শ্রীচারু খাঁ	২০৩
নতুন ধাঁধা	শ্রীবিনয় বাগচী	২৭৪, ৫৯২
নতুন ধাঁধা		৩৩৮
নতুন ধাঁধা	সুভাষ মণ্ডল ও বিচিত্র গুহ	৪০৩
নতুন ধাঁধা	শ্রীমলয়বিজন ভট্টাচার্য	৬৫৮
নতুন ধাঁধা	শ্রীআশিসকুমার ভূঞ্যা	৭২৬
নতুন ধাঁধা	শ্রীঅবিনাশ চৌধুরী	৭৮৬
নতুন বছরে (কবিতা)	শ্রীঅতীন মজুমদার	১০৯
নাচব-হাসব-বাঁচব (কবিতা)	শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৬১৭
নানা কথা	অমিতাভ চক্রবর্তী	৬৪
নেপালমামার ঘুম	শ্রীবেলা দেবী	৭১৩
	প	
পশুশালা (কবিতা)	শ্রীসুধীর গুপ্ত	৪৯৩
পিরামিডের গল্প	শ্রীসলিল সরকার	৬৮২
পিরামিডের রাণী	শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	৩৬০
পীতাম্বর সার্কাস পার্টি	শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়	৭৭৩
পেনাং শহরের সুপারীর যাদু	যাদুকর এ, সি. সরকার	৭৭৭
পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম		৬৫৯
প্যারিস শহরে এক বন্ধুর ফ্লাটে	যাদুকর এ. সি. সরকার	২৫৯
প্রায়শ্চিত্ত	শ্রীতপনকুমার চক্রবর্ত্তী	২৬২

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	ফ	
ফাল্গুন (কবিতা)	শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী	৬৬৩
ফুলরাণী	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৫৩
	ব	
বইয়ের ঝুলি		৪০২
বকুল ফুলে ম্যাজিক্	যাদুকর এ. সি সরকার	৫১৭
বজ্রানন্দ	ভৈরবপ্রসাদ হালদার	৪২৬
বড়দের কথা	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	২৬৪
বদনের বাগান	স্বপনবুড়ো	৫০৮
বরফের দেশ	শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার	৩৪, ১০৪, ১৫৩, ২০৯, ৩২৩, ৩৪২, ৫০০, ৫৬৩, ৬০৪, ৬৯৪
বর্ষা (কবিতা)	শ্রীআশানন্দন চট্টরাজ	১৪০
বর্ষার পল্লী (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৬১
বর্ষার রূপ (কবিতা)	শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩৯
বসন্ত এসেছে (কবিতা)	শ্রীবাউল দাশ	৭২৯
বাঘবন্দী (কার্টুন)	চণ্ডী লাহিড়ী	৪০৮
বাড়ীগুলো যদি গাড়ী হতো (কবিতা)	শ্রীশান্তশীল দাশ	৭২৭
বাতাসের খেলা	শ্রীমলয়কুমার সরকার	৬৪৯
বিজ্ঞান-পত্র	সঞ্জয়	৫৯, ১৩০, ২৪৮, ৩৩১, ৩৭৯, ৪৬৩, ৫২৮, ৫৬৯, ৬২৫, ৬৯৯, ৭৭৯
বিজ্ঞানের খেলা	শ্রীগজেন্দ্রকুমার দেব রায়	৩৪৮
বিদেশী গল্পগুচ্ছ	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা	৩, ১২২, ১৯১, ২৫১, ২৮৬, ৩৮০, ৫৫২, ৬৬৪
বিদ্যাদেবী (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রকুমার ঘোষ	৭২০
বিস্ময়	শ্রীরমেন দাস	৪৬৫
বুদ্ধির ঢেঁকি বোকারাম	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	১৭৩
বুদ্বুদের বড়াই	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭২
বৈশাখ মাসের ছবির ধাঁধার উত্তর		২০৪
বৈশাখ মাসের ধাঁধা প্রতিযোগিতার ফল		২০৪

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
বোকাও চালাক হয়	ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৭০২
ব্যাঙ্ আর রুপালি পাতা	শ্রীমুরারিমোহন বিট	৬৪০
ব্যাঙ্কক যাবার পথে রেলের কামরায়	যাদুকর এ সি. সরকার	১৮০
	ভ	
ভবা পাগলা	শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৫
ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক	অমরনাথ রায়	২৪
ভৌতিক বাক্সের খেলা	যাদুকর বি. দাস	৫৮৮
	ম	
মহারাজ ও বাঘ	শ্রীহরিপদ রায়	৬৭২, ৭৪৯
মহারাজার দান (কবিতা)	শ্রীনীলরতন দাশ	৬০৩
মহিষাসুর বধ	শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী	৪০৭
মহীয়সী নারী	শ্রীসতীরাম বিশ্বাস	৩২৮
মাতৃ-ভক্তি (কবিতা)	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	৭৮
মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়	শ্রীসুনীল সরকার	৭৫৫
মিথ্যে শিকারের সত্যি গল্প	শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম	৪৮৫
মুক্তো চুরির রহস্য	শ্রীঅতীন মজুমদার	৭৫০
মুস্কিল আসান	শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা	৫৪৬
মেকি	আগন্তুক	৩৯৭
মেঠো কাহিনী	গৌরী চৌধুরী	৪১৩
	য	
যাঁকে নিয়ে বড়দিন	শ্রীঅতীন মজুমদার	৫৪৩
যাদুকর	স্বপনবুড়ো	৬৮৪, ৭৩৫
যাদুকরের দুর্গে	শ্রীঅমিতাকুমারী বসু	৫৭৭
যে ব্যাঙ্কে টাকা নেই, জীবন আছে	ননীগোপাল চক্রবর্তী	৪৪৩
	র	
রকেটের কথা	শ্রীমানবেন্দ্র নাগ	৫৮৭
রক্তারক্তি	শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়	১৬০
রামধনু (কবিতা)	শ্রীসুধীর গুপ্ত	২৭০
রেঙ্গুনে একদিন সন্ধ্যায়	যাদুকর এ. সি. সরকার	৪০
রোদের ছড়া (ছড়া)	শ্রীঅনুপম দত্ত	৫৯৮

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	ল	
লবণাক্ত	শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়	২৮৩
লাডাক	শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৭
লিমেরিক (কবিতা)	শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র	৩৩০
লিমেরিক (কবিতা)	সুনন্দা দাশগুপ্ত	৪১০
লেখন (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৭
	শ	
শয়তানের থাবা	শ্রীচিত্ত ঘোষাল	২৯৬
শরৎ-ছন্দ (কবিতা)	রেবতীভূষণ ঘোষ	৪০৬
শরীরচর্চার বৈঠক	বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়	৬২, ১৩৩, ১৯৯, ২৭১, ৩৩৪, ৩৯৪, ৫৩১, ৫৮৯, ৬৫৪, ৭২১, ৭৮১
শান্তিনিকেতনে ছোটদের রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী	২৬৭
শিবাজীর মহানুভবতা (কবিতা)	শ্রীকণিভূষণ বিশ্বাস	২৯৪
শিশুসাথী (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪০৫
শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ	শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত	৫০৫
শীত-সকালের রোদ (কবিতা)	শ্রীঅমলেন্দু দত্ত	৪৬৯
শীতের প্রাতে (কবিতা)	শ্রীবাউল দাশ	৫৯৫
শেষ পর্যন্ত	শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম	৬১৩
	স	
সজারু	শ্রীবিজয়গোপাল বসু	২২৭
সঙ্গীতজ্ঞদের উদ্ভট পরিকল্পনা	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য	১৭২
সম্পাদিকার চিঠি		৬৯, ১৩৮, ২০৫, ২৭৫, ৩৩৯, ৪০৪, ৪৬৮, ৫৯৩, ৬৬০, ৭২৭, ৭৮৭
সাগরের নীচে যা আছে	শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭৭
সাপের মুকুট	রাজলক্ষ্মী দাশগুপ্ত	৪৩৭
সিঙ্গাপুরের উড়ন্ত ডিম	যাদুরত্নাকর এ. সি. সরকার	৩৮৮
সোনালী গাছের সোনালী পাখী	শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা	৪৭০
সোনালী নদীর দেশে	ডাঃ কল্যাণী প্রামাণিক	৪৫৩
সৌদী আরবের রীতিনীতি	শ্রীঅমিতাকুমারী বসু	১২

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	হ	
হংকংএ এক শিশু-মজলিসে	যাদুকর এ. সি. সরকার	৭১১
হংকং-এর ক্যাথে ক্লাবে	যাদুকর এ. সি সরকার	৬৩৮
হাত তোলো—কে তুমি ?	শ্রীঅনন্ত সিংহ	৬২৮
হানা (কবিতা)	শ্রীমতী বাণী রায়	৪২০
হার (কবিতা)	শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ	৫৫৯
হারানো নাম	শ্রীমাধব পাল	৫৮৫
হাসির দেশ (কবিতা)	শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত	৫৪৫
হিং টিং ছট্	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু	৭৪০
হীরকের কথা	শ্রীজ্যোতির্ময় হুই	৭৫৮
হে কবি জ্যোতির্ময় (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	১৪

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER (Shishusathi) TO BE PUBLISHED IN THE FIRST ISSUE EVERY YEAR AFTER THE LAST DAY OF FEBRUARY

FORM IV

1. Place of Publication—5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.
2. Periodicity of its publication—Once in a month.
3. Printer's Name—Ramkrishna Paul.
   Nationality—Indian.
   Address—5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.
4. Publisher's Name—Ramkrishna Paul.
   Nationality—Indian.
   Address—5. Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.
5. Editor's Name—Srimati Dasgupta.
   Nationality—Indian.
   Address—5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital—Brindabon Dhar & Sons, Private Ltd.
   5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.

N. B.—Number of Share holdings subject matter of suit.

I, Ramkrishna Paul, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Ramkrishna Paul.

Date—13. 3. 67. Signature of Publisher.

আমি,
টুটুল,
দিপু -

আমাদের সকলেরই ভালো লাগে —

মার্গো সোপ এর প্রচুর নরম ফেনা কোমল চামড়ার পক্ষে সত্যিই খুব ভাল।

নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহারে দাঁত ঝক্‌ঝকে ও মাঢ়ী শক্ত হয় এবং দাঁতের অসুখ হয় না।

ক্যাষ্টরল মাথায় মেখে স্নান করলে কি আরাম। তাছাড়া মাথায় কত চুল হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝক্‌ঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাঁসি।

সাধনা দশন

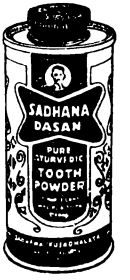

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

শিশুসাথী

ছোটদের সেরা রুচিশীল মাসিকপত্র

আগামী বৈশাখে

৪৫ পার হয়ে সগৌরবে ৪৬ বছরে পড়ছে

শিশুসাথী কখনো পুরানো হয় না—

শিশুর মতই শিশুসাথী চিরনূতন

ছোটদের মনের খোরাক জোগায় শিশুসাথী

অভিভাবক আর শিক্ষাবিদরাও ছোটদের জন্য শিশুসাথীকেই পছন্দ করেন। কারণ শুধু গল্প, কবিতাই নয়—ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, ম্যাজিক, ব্যায়াম, বুদ্ধির খেলা, ছবিতে গল্প, খেলাধূলা, তোমাদের পাতা, এ সবই থাকে শিশুসাথীর পাতায়। শ্রেষ্ঠ লেখক আর শিল্পী তাঁদের লেখায় আর রেখায় সাজিয়ে দেন শিশুসাথীকে। স্বাধীন দেশের ভাবী নাগরিককে ঠিক ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে শিশুসাথী।

নিয়মিত বিভাগগুলির সঙ্গে নতুন বছরে যাঁরা নিয়মিতভাবে লিখবেন :—

শিবরাম চক্রবর্তী	ধীরেন্দ্রলাল ধর	স্বপনবুড়ো
আশা দেবী	সুমথ নাথ ঘোষ	শৈল চক্রবর্তী
বিশু মুখোপাধ্যায়	বিধায়ক ভট্টাচার্য	রবিদাস সাহারায়
মনোরম গুহ-ঠাকুরতা	ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	মনোজ বসু	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
গজেন্দ্র কুমার মিত্র	অদ্রিশ বর্ধন	আশাপূর্ণা দেবী

এবং আরও অনেকে

যারা এখনো গ্রাহক হওনি তারা অবিলম্বে চাঁদা পাঠিয়ে

নূতন বছরের পত্রিকার জন্য নিশ্চিন্ত হও।

চাঁদা (সডাক) : বার্ষিক ৬ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৬০ প:

— বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড —

৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২